মাসিক

নবীনকণ্ঠ

nabinkantho.com

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি. । জু. উ.-১৪৪৭ হি.

কার্তিক, ১৪৩২ ব. । ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

প্রিয় শিক্ষক সংখ্যা

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

মাসিক নবীনকণ্ঠ
nabinkantho.com
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

প্রতিষ্ঠা
ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি.
৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা
জু. উ. ১৪৪৭ হি.
কার্তিক ১৪৩২ ব.

উপদেষ্টা
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

তত্ত্বাবধানে
মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবাইর
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী
আনিসুর রহমান আফিফি

প্রধান সম্পাদক
মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক
উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক
বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক
কাজী মা'রুফ
রাশেদ নাইব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সায়েম আহমদ

প্রিয় শিক্ষক সংখ্যা

আমাদের সবার জন্য একটি খুশির খবর। আপনাদের প্রিয় নবীনকণ্ঠের নিজস্ব ওয়েবসাইট উন্মোচন হয়েছে। যেখানে প্রত্যেক সংখ্যার লেখা প্রকাশ করা হয়। গুগলে গিয়ে সার্চ করুন;–
nabinkantho.com

যদি নবীনকণ্ঠ 'প্রিন্ট' করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম, তাহলে বেশি ভালো লাগত। আপাতত 'পিডিএফ' করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দু'আয় আমাদের স্মরণ করবেন।

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

যাদের কলমে

ফুটেছে শ্রদ্ধার ফুল

প্রিয় শিক্ষক সংখ্যা

ছড়াকার

মোহাম্মদ আবুল কাসেম, মিয়াজী তোফায়েল আহমাদ, তোফায়েল এ আর, নজমুল ইসলাম খসরু, সৈয়দ আহম্মেদ সাদি, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, আব্দুল কাদের, মাহমুদুল হাসান খোকন, দিলীপ কুমার পাত্র, জুলেখা চৌধুরী, রানা জামান, সাইদুল ইসলাম সাইদ, মো. সাব্বির হোসেন টুটুল, বিধান চন্দ্র দেবনাথ, মিজান পঞ্চায়েত, সাইদুল ইসলাম সাইদ, বি এম মিজানুর রহমান, আহমেদ আশিক, মিহির পাল, শাহজালাল সুজন

কবি

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আল মাহমুদী, মো. মাঈন উদ্দীন রাকিব, বদরুল হক, হাসান মুসান্না মিশু, উমাইরা নাবিহা, বসন্ত পরামাণিক, ফটিক ঘোষ, রাজ্জাক রাজ, রিদয় ইসলাম, আবু জুবায়ের, আব্দুস সাত্তার সুমন, রাকিবুল হাসান, অ্যামেলিয়া দাস, মুহাম্মদ আবু সালেহ, মো. ফরুক হোসেন, মেরাজুল ইসলাম শওকত, শাহীন খান

অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি. । জু. উ.-১৪৪৭ হি.

কার্তিক, ১৪৩২ ব. । ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

মাসিক নবীনকণ্ঠ
nabinkantho.com
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

সম্পাদকীয়

যিনি আমাদের কলমে শক্তি দান করেছেন, সেই মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি সেই প্রিয় নবি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি মানবতার অন্ধকারে জ্বালিয়েছিলেন জ্ঞানের প্রদীপ।

নবীনকণ্ঠের এবারের সংখ্যা 'প্রিয় শিক্ষক'। আলহামদুলিল্লাহ, এটি আমাদের একাদশতম সংখ্যা। ধীরে ধীরে নবীনকণ্ঠ এগিয়ে চলেছে আপনাদের ভালোবাসা, অনুপ্রেরণা ও দোয়ার বলেই। প্রতিটি সংখ্যার পর আমরা নতুন সাহস পাই, নতুন স্বপ্ন দেখি- আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থনই আমাদের চলার শক্তি।

এই সংখ্যার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছিল সম্পাদকমণ্ডলীর পরামর্শক্রমে। আলহামদুলিল্লাহ, সাড়া ছিল আশাতীত! এত বিপুল সংখ্যক লেখা ও অনুভূতি পেয়ে আমরা সত্যিই আপ্লুত। লেখাগুলো গুছিয়ে নেওয়া, বাছাই ও সম্পাদনা করা ছিল এক কঠিন কিন্তু আনন্দময় পরিশ্রম। শত ব্যস্ততার মধ্যেও সম্পাদকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, শুধু আপনাদের ভালোবাসার টানে।

তবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য- আমরা লক্ষ করেছি, কিছু লেখক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে লেখা পাঠাচ্ছেন। এটা সাহিত্য বা সৃষ্টিশীলতার জন্য শুভ নয়। আমাদের চৌকস সম্পাদকমণ্ডলী এসব লেখা শনাক্ত করেন এবং সেগুলো গৃহীত হয় না। তাই অনুরোধ করছি- নিজের অনুভূতি, চিন্তা ও মেধা দিয়ে লিখুন। একবার না হলে আবার লিখুন, পুনরায় পাঠান। ইনশাআল্লাহ, একদিন আপনার লেখাই হবে সেরা। নিজের ভেতরের প্রতিভাকে বিকশিত হতে দিন, কলম হোক আপনার পরিচয়।

প্রিয় শিক্ষক সংখ্যা- এই সংখ্যায় আমরা পেয়েছি হৃদয়ছোঁয়া অনেক লেখা, যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। শিক্ষক কেবল জ্ঞানের দাতা নন, তিনি আমাদের চরিত্র ও জীবনের নির্মাতা। শিক্ষকের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা তখনই প্রকাশ পায়, যখন আমরা তাঁর জন্য দোয়া করি, তাঁর পরামর্শকে শ্রদ্ধা করি, জীবিত ও মৃত্যুর পর তাঁর জন্য কল্যাণ কামনা করি। শিক্ষককে সম্মান করা, সেবা করা, তাঁর আদর্শে চলা- এটিই সত্যিকারের ছাত্রত্বের বহিঃপ্রকাশ।

সবশেষে, আমরা বিনীতভাবে স্বীকার করছি- যদি কোথাও কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, তা অনিচ্ছাকৃত। আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেবেন। আপনারা যত বেশি এই সংখ্যা ছড়িয়ে দেবেন, ততই নবীনকণ্ঠের বার্তা পৌঁছাবে সর্বত্র, তরুণ লেখকদের অনুপ্রেরণা জোগাবে নতুন স্বপ্নে।

আমাদের ওয়েবসাইটে (www.nabinkontho.com) ভিজিট করে লেখাগুলো পড়ুন, মতামত দিন, শেয়ার করুন। শীঘ্রই আমরা সেরা পাঁচজন লেখক নির্বাচন করে তাদের পুরস্কৃত করব, ইনশাআল্লাহ।

নবীনকণ্ঠের পক্ষ থেকে সবার প্রতি দোয়া ও শুভেচ্ছা।
ভালোবাসা, সাহিত্য ও অনুপ্রেরণায় বেঁচে থাকুক নবীনকণ্ঠ, বেঁচে থাকুক আপনাদের প্রতিটি কলম।

- সম্পাদক

-+

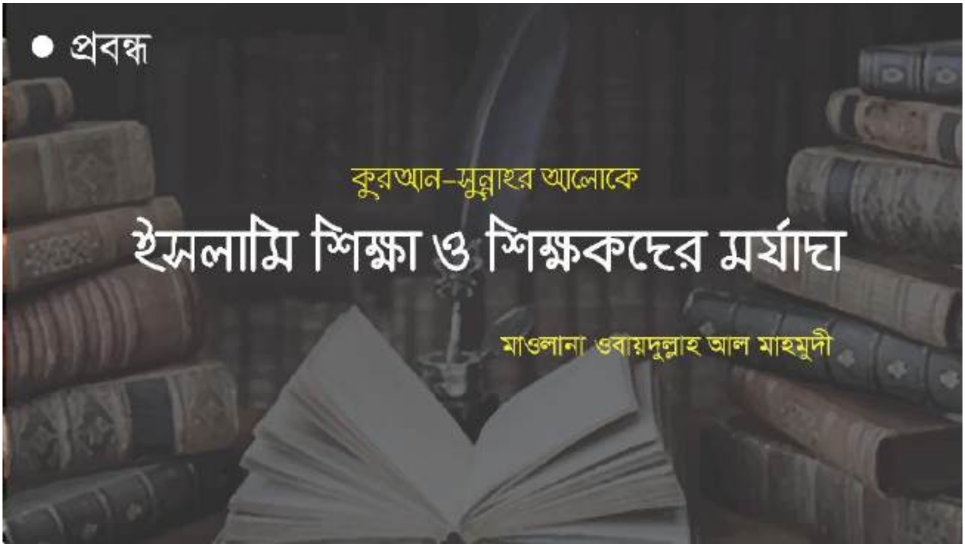

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দই ছিল 'اقْرَأْ (পড়ো)' (সুরা আলাক: ১)। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রথম শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের দাওয়াত দিয়েছে। তবে ইসলামি শিক্ষার লক্ষ্য কেবল দুনিয়াবি প্রাপ্তি নয়; বরং মানুষকে আল্লাহর পরিচিতি, ইমানের দৃঢ়তা, আখলাকের উৎকর্ষ এবং আখেরাতের প্রস্তুতির দিকে পরিচালিত করা।

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন: 'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' (সুরা যুমার: ৯)

অন্যত্র বলেন: 'আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে ও জ্ঞান অর্জন করেছে, তাদের মর্যাদা বহু স্তরে উঁচু করবেন।' (সুরা মুজাদিলা: ১১)

রাসুল ﷺ বলেছেন: 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।' (সহিহ মুসলিম)

এই আয়াত-হাদিসগুলো থেকে স্পষ্ট যে, শিক্ষা শুধু একটি সামাজিক প্রয়োজন নয়, বরং তা ইমান ও ইবাদতের অংশ।

রাসুল ﷺ একজন শিক্ষক

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ সম্পর্কে বলেন: 'তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন।' (সুরা জুমুআ: ২)

রাসুল ﷺ নিজেও বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৯)

অতএব শিক্ষকতা একটি নববিসুলভ দায়িত্ব, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে।

শিক্ষকের মর্যাদা

শিক্ষক হচ্ছেন নবিগণের উত্তরসূরি। রাসুল ﷺ বলেন: 'আলেমগণ হচ্ছেন নবিগণের উত্তরসূরি। নবিগণ দিরহাম-দিনার উত্তরাধিকার রেখে যাননি; তারা রেখে গেছেন জ্ঞান। যে তা গ্রহণ করেছে, সে পরিপূর্ণ ভাগ গ্রহণ করল।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৩৬৪১)

হজরত আলি রা. বলেছেন: 'যে আমাকে একটি অক্ষর শিখিয়েছে, আমি তার দাস হয়ে গিয়েছি।'

এ ছাড়া রাসুল ﷺ বলেছেন: 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান-জমিনের সব সৃষ্টিই সেই ব্যক্তির জন্য দুআ করে, যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৬৮৫) অতএব শিক্ষক কেবল জীবিকার উপায় নয়; বরং তিনি সমাজের পথপ্রদর্শক, জাতির আত্মার প্রকৃত স্থপতি।

ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য

ইসলামি শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য:

১. আকিদা ও ইমানের দৃঢ়তা: মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসুল ﷺ -এর আনুগত্যে দীক্ষিত করা।

২. আখলাক ও চরিত্র গঠন: সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

৩. দুনিয়া ও আখেরাতের সমন্বয়: মানুষকে কেবল দুনিয়াবি নয় বরং আখেরাতমুখী জীবনের প্রস্তুতি করানো।

রাসুল ﷺ বলেছেন: 'মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস চলমান থাকে: সদকা জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং সৎ সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

এখান থেকে স্পষ্ট হয়, উপকারী শিক্ষা প্রদান এমন একটি সওয়াবের কাজ, যা মৃত্যুর পরও চলতে থাকে।

বর্তমান বাস্তবতা

আজকের পৃথিবীতে শিক্ষা অনেকাংশে বাণিজ্যিক হয়ে পড়েছে, শিক্ষক সম্মান হারাচ্ছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য সীমিত হয়ে যাচ্ছে চাকরির মধ্যে। অথচ ইসলামি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই ভয় করে।' (সুরা ফাতির: ২৮)

অতএব প্রকৃত আলেম ও শিক্ষক হচ্ছেন তারা, যাদের মাধ্যমে আল্লাহভীতি ও তাকওয়া বৃদ্ধি পায়।

আমাদের করণীয়

১. ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ করা।

২. শিক্ষক ও আলেমদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা।

৩. শিক্ষকসমাজকে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবনযাপনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে উৎসাহিত করা।

৪. প্রজন্মকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তুলতে শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার আনা।

শিক্ষা মানবতার মুক্তির আলো, আর শিক্ষক হচ্ছেন সেই আলোর বাহক। ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যের পথে পরিচালিত করা। তাই কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান প্রদান আমাদের একান্ত দায়িত্ব। এভাবেই আমরা একটি আলোকিত, নৈতিক ও ইসলামি সমাজ গঠন করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

লেখক, গবেষক ও আলেম

জীবন চলার পথে জীবনের বাস্তবতায় মানুষ যে সকল পেশা গ্রহণ করে থাকে, কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে যত ধরনের মাধ্যম বা উপায় গ্রহণ করে, এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও সম্মানিত পেশা হলো শিক্ষকতার পেশা।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই পৃথিবীর সকল শিক্ষকদের শিক্ষক। পবিত্র কোরআনে মানব সৃষ্টির বর্ণনার পর মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, যিনি (আল্লাহ) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। (সূরা আলাক্ব-৪,৫) এমনিভাবে তিনি পৃথিবীতে সকল নবি রাসূলকে উম্মতের শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়েছেন। যারা দিকভ্রান্ত উম্মাহকে রবের পরিচয় শিখিয়েছেন, সঠিক পথ দেখিয়েছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

পবিত্র কোরআনে তিনি ইরশাদ করেন, তিনি (নবিজি) তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। (সূরা আলে ইমরান-১৬৪)

হাদীস শরীফে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে

কঠোরতা ও চাপ প্রয়োগকারী হিসেবে পাঠাননি। আমাকে পাঠিয়েছেন শিক্ষক এবং সহজকারী হিসেবে। (সহীহ মুসলিম-১৪৭৮)

নবিজির অবর্তমানে আলেমগণ হলো উম্মতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এ হলো দ্বীনি শিক্ষার বিষয়ে।

আর জাগতিক শিক্ষার ব্যাপারেও একজন শিক্ষক অন্যান্য জাগতিক পেশাদারের চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাশীল।

অতএব শিক্ষক হওয়া পরম সৌভাগ্য ও সম্মানের ব্যাপার। কারণ তারা মানুষ গড়ার কারিগর। তারা জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষা দেন। এই শিক্ষক শ্রেণিই হলো সমাজের মূল চালিকাশক্তি। তাদের আদর্শ ও দিকনির্দেশনায় ভবিষ্যত প্রজন্ম যোগ্য ও মানবিক হিসেবে গড়ে উঠে। তাই একজন আদর্শ শিক্ষকের গুরুত্ব ও ফযিলত অনেক বেশি।

বিশেষভাবে যারা দ্বীনি শিক্ষা দেয়- কোরআন ও হাদীসের শিক্ষক রয়েছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সর্বোত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যিনি কোরআন মাজিদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন। (সহীহ বুখারী-৫০২৭)

একজন আদর্শ শিক্ষক শুধু শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তিনি তার ছাত্রের বাবা মায়ের ন্যায় পরম অভিভাবক ও আস্থার প্রতীক হয়ে উঠে। প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে তিনি তার ছাত্রের আদর্শিক অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে থাকেন। এটাই বাস্তবতা।

উস্তাদ মানে পরম অভিভাবক ও অনুপ্রেরণাদায়ী, এর যথার্থতা পেয়েছি উস্তাদে মুহতারাম "মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানী" হাফিজাহুল্লাহু -এর মাঝে। যিনি একাধারে একজন শিক্ষক, খতিব, গবেষক, কলামিস্ট, বিতার্কিক স্কলার এবং উম্মাহ দরদি একজন রাহবার।

অসংখ্য গবেষণালব্ধ বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ-কলাম রয়েছে তার, যা বহু আগেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকেও তিনি নিয়মিত লিখেন।

এছাড়াও তার বিষয়ভিত্তিক সুন্দর সাবলীল আলোচনা রয়েছে অনেক।

উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে আলোচনার মঞ্চকে প্রভাবিত করা তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কর্মক্ষেত্রে তিনি একজন পরিপাটি রুচিশীল অভিজ্ঞ কর্মবীর।

দুর্যোগ সংকট নিরসনেও তিনি সেবামূলক বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত আছেন। সর্বোপরি ইসলাম দেশ ও জাতির কল্যাণে তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ পুরুষ। ক্ষণজন্মা বহুমুখী প্রতিভাবান এমন উস্তাদের সংখ্যা সত্যি বিরল।

আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন একজন উস্তাদের ছাত্রত্ত ও সান্নিধ্য লাভ করেছি এবং স্নেহ ও অভিভাবকত্ব পেয়েছি। সত্যিই আমি অনেক ধন্য, গর্বিত ও ভীষণ আনন্দিত।

আমার মতো এরকম অসংখ্য ছাত্রের তিনি অভিভাবক ও আস্থার প্রতীক। যার পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা গ্রহণ করে তারা নিজেদের পথ চলে। এ যেন এক সাহাবি জীবনের নববি পরশ। সত্যিকারের উস্তাদ এমনই হয়।

আল্লাহ তাআলার নিকট উস্তাদে মুহতারাম সহ আমার সকল উস্তাদবৃন্দের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

শিক্ষাসচিব, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ সাভার, ঢাকা।

সাবেক শিক্ষার্থী, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা জীব)। আর মানুষকে প্রকৃত অর্থে 'মানুষ' হয়ে ওঠার পেছনে অনেকের অবদান থাকে। যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তারই অন্যতম হলেন উস্তায বা শিক্ষক। তিনি আমাদের অন্ধ হৃদয়ের মহৌষধ। মনের সংকীর্ণতা দূর করে, জাগ্রত করেন চেতনাবোধ। আমাদের শিক্ষা দেন কীভাবে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হবে। ভালোবাসতে হবে সমাজের মানুষকে। জ্ঞান আর ব্যবহারে আলোকিত করে তুলতে হবে আমাদের এই অন্ধকার সমাজটাকে। জীবনে সাফল্যের পেছনে একজন উস্তাযের শ্রম আর ত্যাগ অনিস্বীকার্য।

প্রত্যেকের জীবন আলোকিত হওয়া, এবং তার অপূর্ণ আশাগুলো পূরণ হওয়ার পেছনে কোনো না কোনো উস্তাযের সার্বিক দিকনির্দেশনা আর অনুপ্রেরণা থাকে, যা অর্থ দিয়ে পাওয়া যায় না।

পিতা-মাতা আমাদের জীবনদান করেন। জীবনের এই দীর্ঘ সফরে যেমন আব্বা-আম্মার ভূমিকা থাকে, তেমনই একজন উস্তাযেরও সমান ভূমিকা থাকে। একজন দায়িত্ববান, নিবেদিতপ্রাণ উস্তায আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক সাহায্য করেন।

সবার জীবনেই কোনো না কোনো উস্তাযের আলাদা একটা প্রভাব থাকে। যাদের কথা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা জরুরি। কারণ তিনি/তারা এমন, যারা চিন্তার দিকনির্দেশনা দেন। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে দেন। তাদের প্রতিটি বাক্য, উপদেশ, এমনকি নীরবতাও হৃদয়ের গভীরে ছাপ ফেলে। তাই যে সকল উস্তায আমাদের অন্তরকে নাড়া দেন। আমাদের চিন্তার ভিত রচনা করেন, তাদের কথা সাধারণভাবে নয়, বরং গভীর অনুরাগ ও সম্মানের সঙ্গে উপস্থাপন করা উচিত।

আমার জীবনেও আছে এমন বেশ কয়জন উস্তায। যাদের কাছে আমি চিরঋণী। তন্মধ্যে মুফতি শোয়াইব আহমাদ, মুফতি আজিজুল হক, মাওলানা ইমামুল হক হাফি. অন্যতম। আমার জীবনে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং ইনশাআল্লাহ...।

আল্লাহ তাআলার বে-ইনতিহা শোকর যে, তারা আমার ভাগ্যে জুটেছেন। নয়তো বা হয়তো আজ আমিও কালের আবর্তে হারিয়ে যেতাম।

রব্বে কাবার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাদের ছায়াকে আমার উপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করুন।

শিক্ষার্থী, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। আরবি ইলম শব্দ দ্বারা জ্ঞান, অনুধাবন ও উপলব্ধি করাকে বোঝানো হয়। বাংলা ভাষায় কখনো কখনো ইলম শব্দ দ্বারা বোঝানো হয় জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা বা বিদ্যা।

মুসলমানের প্রতি প্রথম বার্তাই হলো, পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে ইলমেদ্বীন বা শিক্ষার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তা ছাড়া ইসলাম থেকে ইলমকে পৃথক করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি শাখায় ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথার্থভাবে ইসলাম পালন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের পক্ষে ইবাদত-বন্দেগি (নামাজ রোজা) সহ ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে তা সুন্দর ও শুদ্ধভাবে আদায় করা যায়, তা জানা প্রত্যেক মানুষের ওপর ফরজে আইন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।' (ইবনে মাজাহ: ২২৪)

এই ইলম বা জ্ঞান অর্জনের নানা উপায়-উপকরণ আছে, যেগুলোর মাধ্যম নিয়ে একজন ব্যক্তি দ্বীন-দুনিয়ার ইলম বা জ্ঞান অর্জন করে থাকে, এসবের মধ্যে অন্যতম একটি মাধ্যম হলো—ওস্তাদ বা শিক্ষক। যে লাইনের হোক না কেন,

সকল লাইনের জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম ওস্তাদ বা শিক্ষক।

ওস্তাদ বা শিক্ষকের দুআঃ

ইলম হলো এমন কিছু, যা পেতে হলে ওস্তাদের দুআ লাগে। ওস্তাদ মানে মক্তব থেকে শুরু করে দাওরায়ে হাদিসের ওস্তাদ পর্যন্ত সব স্তরের শিক্ষককে বুঝায়। যে যত মেধাবীই হোক, জীবনে কোনো একজন ওস্তাদের সাথে বেয়াদবি করার পরও ভালো আলেম হতে পেরেছে, এমন একটা নজিরও কি কেউ দেখাতে পারবে? তাই জীবনের উন্নতি-অবনতি ও সফলতা-ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মা-বাবা ও ওস্তাদের দুআ ও বদ দুআর বিরাট প্রভাব রয়েছে। বিশেষত আমরা যারা (তালিবুল ইলম) শিক্ষার্থী, তাদের দুনিয়া-আখেরাতের কামিয়াবির জন্য ওস্তাদের দুআ ও তাওয়াজজুহর বিকল্প নেই। এটি আমাদের জীবন-পথের পাথেয়। ওস্তাদের দুআ-তাওয়াজ্জুহ যেমন একজন তালিবে ইলমকে উন্নতির পরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে, তেমনই তাঁদের অন্তরের চোট ও ব্যথাও চরম হতে পারে ক্ষতির কারণ। শুধু ইলমি যিন্দেগীতেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই উন্নতি ও অবনতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেহেতু ওস্তাদ বা শিক্ষক জ্ঞানার্জনের মাধ্যম, তাই স্বাভাবিকভাবেই মাধ্যম সংরক্ষণ না করলে ইলম বা জ্ঞান আসবে না। তাই ওস্তাদের ইজ্জত-ইহতেরাম ও আনুগত্য করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে হজরত আল্লামা জারনূযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, যে ছাত্র ওস্তাদের সম্মান করে না; সে আলেম হতে পারবে না। এজন্যই তো হজরত আলি রা. বলেছেন, 'যিনি আমাকে একটি অক্ষর শিক্ষা দিয়েছেন, আমি তার গোলাম। চাইলে তিনি আমাকে বিক্রি করে দেবেন, চাইলে গোলাম হিসেবে ব্যবহারও করতে পারবেন।' (তালিমুল মুতাআল্লিম:২৫)

বোঝা গেল, যারা ইলম ও ওস্তাদের এহতারাম করে না, তারা কখনো ইলম দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

ওস্তাদ বা শিক্ষকের প্রতি বিনয়:

বিনয় শব্দের অর্থ নম্রতা, ভদ্রতা, কোমলতা, মিনতি প্রভৃতি। নম্রতা শব্দের অর্থ বিনীত, ঔদ্ধত্যহীন, নিরহংকার, অবনত, নরম, কোমল, শান্তশিষ্ট প্রভৃতি। শিক্ষাজীবনে শিক্ষার্থীকে ওস্তাদ বা শিক্ষকের সাথে বিনয়ী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। উপরন্তু এই বিনয়াবনতা, একজন ছাত্রের সৌন্দর্যস্বরূপ। এই গুণ যে-ই ছাত্রের ভেতরে যত বেশি পাওয়া

যাবে, তার জ্ঞান ততই বৃদ্ধি পাবে। ধীরে ধীরে পরিপক্কতাও লাভ করবে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ইলম বা জ্ঞান সে শিক্ষার্থী লাভ করতে পারবে না; যার মধ্যে উদ্ধ্যতা ও অহংকার থাকবে।' (বুখারিঃ ১/২৩২)

ওপর এক বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমরা যার কাছ থেকে ইলম বা জ্ঞান শিক্ষা করছ, তাঁর প্রতি বিনয়ী হও।' (জামেউল হাদিসঃ ১১০২)

ওপর এক বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মান, মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।' (কানজুল উম্মালঃ ৮৫০৮)

উপরিউক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা বোঝা গেল, ছাত্রদের জন্য জরুরি হলো- নিজের সকল স্তরের শিক্ষকদের সাথে বিনয়ের আচরণ-উচ্চারণ করা।

মিনতির সাথে আহ্বানঃ

এ কথা সত্য যে, মানুষের কৃতকর্মের ফলেই তার ওপর বালা-মুসিবত আসে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বান্দা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না, কোন গুনাহর কারণে কোন মুসিবতটি এসেছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, ছাত্র জামানায় একটু চনমনে থাকতে, একটু ছটফট করতে ভালো লাগে–জানি। সুতরাং যা খুশি করো। শুধু একটা কাজ করা যেতে পারে। কখনো কোনো ওস্তাদ বা শিক্ষকের সাথে বেয়াদবি করা যাবে না। ওস্তাদ বা শিক্ষকের বিরুদ্ধে মাঠে নামা যাবে না। ওস্তাদ বা শিক্ষক ভালো না মন্দ, ন্যায় করছেন, না অন্যায়, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। মনে রাখতে হবে, আমাদের কোনো কথা, কাজ বা আচরণে আমাদের কোনো উস্তাদের চোখ থেকে একফোঁটা পানিও যদি বেরিয়ে যায়, খোদার কসম! ইলমের 'আইন'-ও কোনো কাজে লাগবে না।

মুহাদ্দিস, জামিয়া কাশেফুল উলূম মাদ্রাসা, মধুপুর, টাঙ্গাইল

মানুষের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালান যিনি, তিনি হলেন শিক্ষক। শিক্ষক শুধু পাঠ্যবইয়ের তথ্য দেন না- তিনি আলোকিত করেন মন, গড়ে তোলেন চরিত্র, জাগিয়ে তোলেন নৈতিকতা ও মানবতা। তাই শিক্ষক দিবস শুধু একটি স্মরণদিবস নয়, এটি এক গভীর আবেগের প্রকাশ-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উৎসব।

শিক্ষা হলো মানবজীবনের দিকনির্দেশনা। শিক্ষা মানুষকে সচেতন, চিন্তাশীল এবং দায়িত্ববান করে তোলে। অজ্ঞতার অন্ধকারে যে মানুষ হারিয়ে যায়, তাকে আলো দেখান শিক্ষক। এক শিক্ষকের জ্ঞান শুধু পাঠে সীমাবদ্ধ থাকে না; তাঁর চিন্তা, তাঁর কথন, তাঁর নীরব উপস্থিতিই শিক্ষার্থীর জীবনে এক অনন্ত প্রেরণার উৎস।

শিক্ষা কেবল পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার মাধ্যম নয়, এটি হলো মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। সেই মানুষ তৈরির কারিগরই শিক্ষক। শিক্ষক এমন এক ব্যক্তি, যিনি অন্যের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেন, অথচ নিজে অন্ধকারে থেকেও তাতে তৃপ্তি খুঁজে পান। তিনি ছাত্রের ব্যর্থতায় চিন্তিত হন, সাফল্যে আনন্দ পান। তাঁর প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শিক্ষা ভবিষ্যতের বীজ হয়ে মাটিতে রোপিত হয়। একজন ভালো শিক্ষক কখনো শুধু পাঠ্য নয়, জীবন শেখান। তিনি শিখিয়ে

দেন কেমন করে বিপদে সাহসী হতে হয়, কেমন করে নিজের ভুলকে উপলব্ধি করতে হয়, আর কেমন করে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হয়।

আমাদের জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে, যখন আমরা হাল ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু একজন শিক্ষক ঠিক তখনই মনে করিয়ে দেন-"তুমি পারবে।" সেই এক বাক্যই অনেক সময় একটি জীবন বদলে দেয়।
একজন শিক্ষক ছাত্রের অন্তরে যে আত্মবিশ্বাস জাগান, সেটিই তার সবচেয়ে বড় উপহার। এই প্রেরণাই এক সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে তোলে, স্বপ্নবাজ করে তোলে, জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করে।

শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা শুধু আনুষ্ঠানিক নয়, এটি হৃদয়ের অনুভূতি। শিক্ষক দিবসে আমরা তাঁদের স্মরণ করি, কিন্তু তাঁদের অবদান প্রতিদিনই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।
যেভাবে শিকড় মাটির নিচে থেকে গাছকে জীবন দেয়, তেমনি শিক্ষক নীরবে শিক্ষার্থীর সাফল্যের ভিত গড়ে দেন। তাই শিক্ষক দিবস আমাদের শেখায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে-সেই মানুষগুলোর প্রতি, যাঁরা আমাদের জীবনটাকে গড়ে তুলেছেন নিঃস্বার্থ ভালোবাসায়।

একজন মহান শিক্ষক শুধু জাতি নয়, সভ্যতাকেও গঠন করেন। তাঁর হাতে নির্মিত হয় আগামী দিনের নেতা, কবি, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক-এমনকি সৎ নাগরিক।
তাই শিক্ষক দিবস কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতিফলন। এই দিনে আমরা প্রতিজ্ঞা করি-আমরা শিক্ষকদের সম্মান করব, তাঁদের দেখানো পথে চলব, এবং তাঁরাই যেন আমাদের জীবনের প্রেরণার চিরন্তন প্রতীক হয়ে থাকেন।
"শিক্ষক আলোর উৎস, তাঁর আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি জীবন।"

লেখক, অভিনেতা (থিয়েটারিস্ট), শিশুশিল্পী

শিক্ষক প্রেরণার উজ্জ্বল প্রদীপ

● তাহেরা জান্নাত আতর্য়িম

শিক্ষক মানে হলো জ্ঞানের ভান্ডার। যার জ্ঞানের দীপ্ত আলোয় একজন মানুষ আলোকিত, সুশিক্ষিত হয়ে আদর্শ জীবনযাপনে সক্ষম হয়। পৃথিবীতে এমন একজন শিক্ষক ছিলেন, যিনি একাধারে আদর্শবান, মেধাবী, বিচক্ষণ, প্রগতিশীল, মমতাময়ী ও মহৎ গুণের অধিকারী। তিনি হলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সমগ্র ধরণি। তাঁর শিক্ষার ধরন ছিল ভিন্ন। তিনি গতানুগতিক সবাইকে একধরনের শিক্ষা দিতেন না। তার বিচক্ষণতা ছিল প্রখর। তিনি শিক্ষার্থীদের মন-মনন, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, ইমানের স্তর, আমল, স্বভাব, স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদি সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে একই মজলিসে একই প্রশ্নের উত্তর দিতেন ভিন্ন ভিন্ন।

তাঁর শেখানো শুধু মৌখিক নয়, তিনি সাহাবিদের হাতে-কলমে শেখাতেন। তিনি ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী। নবিজি শিক্ষার্থীদের হৃদয় অপত্যস্নেহে ভরিয়ে তুলতেন, শিক্ষার্থীরা নবিজিকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষকদেরও শিক্ষক। তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করলেই একজন ছাত্র ও শিক্ষক আদর্শ, সফলকাম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। তাঁর শিক্ষক হওয়া সম্পর্কে নিজেই বলেছেন,

অর্থাৎ: আমি তো কেবল একজন শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।

নবিজি শিক্ষক হওয়ার স্বীকৃতি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালাও বলেছেন। যাতে আমরা নবিজির প্রতিটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে এক রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন, যদিও পূর্বে তারা ছিল প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে।’

পৃথিবীর বুকে অসংখ্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে; এঁরাই শিক্ষক। কিন্তু এই বিশাল তারকা মণ্ডলীর মধ্যে এমন একদল মানুষ আছেন, যাঁদের দীপ্তি পার্থিব মানদণ্ডের অতীত, অথচ সমাজের দৃষ্টিতে তাঁরাই সবচেয়ে ম্লান। তাঁরা হলেন মাদরাসার শিক্ষকগণ। তাঁদের অবস্থান সমাজের নিম্নতম ধাপে, দারিদ্র্যের কঠিন ফ্রেমে বাঁধা; কিন্তু আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ডে, নৈতিকতার উচ্চ শিখরে, তাঁরাই সকল শিক্ষককুলের চূড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী।

মাদরাসার শিক্ষক যে জ্ঞানের মশাল বহন করেন, তা কোনো মানবরচিত গ্রন্থ থেকে আহূত নয়, বরং তা সরাসরি আকাশের আলো, ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন এবং সুন্নাহর অমৃত। তাঁরা স্রেফ একটি পাঠ্য বিষয় শেখান না, বরং শেখান জীবন-বিধানের স্থাপত্য। মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নবি কারীম (সা.) নিজেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর ঐশী সিলমোহর দিয়ে গেছেন। হজরত মুহাম্মদ (সা.)বলেছেন:
"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং (অপরকে) শিক্ষা দেয়।" সহিহ বুখারি (হাদিস নং: ৫০২৭)।

এই বাণী কি কেবল একটি সাধারণ উপদেশ? নয়। এটি হলো নবুয়তের উত্তরাধিকারের সনদ। এই শিক্ষকরা নবির পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানবাত্মাকে কুরআনের সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চারিত করেন। তাঁরা কেবল অক্ষর নয়, 'আখিরাতের পথ নকশা' পড়ান; শুধু নৈতিকতা নয়, আত্মার পরিশুদ্ধির চাবিকাঠি তুলে দেন। তাঁদের প্রতিটি ক্লাস যেন ইহকালের অস্থিরতা থেকে পরকালের চিরন্তন শান্তির পথে পরিচালিত করার এক নিপুণ চেষ্টা। এই অলৌকিক জ্ঞানের ধারক হওয়ায়, তাঁদের মর্যাদা কোনো পার্থিব মানদণ্ড বা বেতনের অঙ্কে মাপা যায় না। তাঁরা আলো-পুরুষ, অন্ধকার সরাতেই যাঁদের জন্ম।
এই জ্ঞান-পুরুষেরা জাতির মেরুদণ্ড নির্মাণে নীরবে শ্রম দেন। তাঁরা কোমল হৃদয়ে ইমান, আমল ও আখলাকের সেই বুনিয়াদ গেঁথে দেন, যা আধুনিকতার সর্বনাশা স্রোতেও টিকে থাকতে পারে। তাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করেন, যারা কেবল প্রযুক্তি নয়, নৈতিকতার আলোতেও সমাজকে আলোকিত করবে।

কিন্তু, দুঃখজনক হলেও সত্য! এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাতারা আজ অর্থনৈতিক দীনতার শিকার, সামাজিক তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার। তাঁদের সাধারণ জীবনযাত্রাকে দেখে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই। আমরা ভুলে যাই, যে হাতে কুরআনের পবিত্র পাতা উলটানো হয়, সেই হাতকে অবহেলা করা মানে প্রকারান্তরে জাতির নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেওয়া। এটা যেন সমাজের এক নীরব, অথচ ভয়াবহ আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র-যেখানে জ্ঞানের সবচেয়ে পবিত্র উৎসকেই অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।
সময় এখন জেগে ওঠার, হে জাতি! মাদরাসার শিক্ষকগণ কেবল পাঠদাতা নন, তাঁরা নবির উত্তরাধিকারী এবং আমাদের আত্মার

আলোকবর্তিকা। তাঁদের প্রতি অবহেলা করা মানে স্বয়ং ঐশী শিক্ষাকে অবমূল্যায়ন করা।

সুতরাং, শুধু মুখের কথায় নয়, হৃদয়ের গভীরে তাঁদের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করতে হবে। আমাদের কর্তব্য:

- তাঁদের আর্থিক দীনতা দূর করতে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসা।
- সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁদের যথোপযুক্ত সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া।
- তাঁদের নিঃস্বার্থ জ্ঞান বিতরণের সামনে বিনম্র হওয়া।

আসুন, আমরা সেই বিবেকহীনতা ত্যাগ করি, যা আলোর কারিগরদের অন্ধকারে ঠেলে দেয়। মাদরাসার শিক্ষককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিন, তবেই জাতি হিসেবে আমরা সেই নৈতিক শক্তি ফিরে পাব, যা আমাদের পার্থিব সফলতা ও পারলৌকিক মুক্তির দিকে চালিত করবে। তাঁদের সম্মান করাই হলো মানবতার প্রতি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থী

শিক্ষক-এই শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের অমলিন আলো, সাহসের অনুপ্রেরণা এবং জীবনের অগণিত দিশার সূচনা। একজন শিক্ষক কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান দেয় না, তিনি আমাদের চরিত্র গঠনে, নৈতিকতাকে দৃঢ় করার এবং জীবনের সঠিক পথ বাছাই করার ক্ষমতাও জাগিয়ে দেন। শিক্ষকের শিক্ষাই আমাদের জীবনের প্রথম আলো, যা অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখায়।

প্রতিটি শিশুর জীবনে শিক্ষক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। ছোটবেলা থেকেই আমরা তাদের কাছ থেকে শিখি- শুধু হরফ বা সংখ্যা নয়, বরং জীবনের মূল্যবান পাঠ। মাদরাসার উস্তাদগণ আমাদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন, যা কেবল পরীক্ষা বা পঠনপাঠনের জন্য নয়, বরং বাস্তব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়ায়। তাদেও ধৈর্য, উদারতা এবং আন্তরিকতা আমাদের মনে অম্-ান ছাপ রেখেছে।

প্রিয় শিক্ষক মানে শুধুই একজন পাঠদাতা নয়, তিনি আমাদের বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং কখনো কখনো অভিভাবকের মতো।

আমরা যখন কোনো কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হই, তখন শিক্ষক আমাদের সাহস দেন, আমাদের ভয় দূর করেন এবং আমাদের বিশ্বাস যোগান যে আমরা সবকিছুই করতে পারি। একজন ভালো

শিক্ষক আমাদের কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করে, আমাদের চিন্তাকে স্বাধীন করে এবং আমাদের সৃজনশীলতার নতুন দ্বার খুলে দেয়।

আমি বিশেষভাবে মনে করতে পারি আমার মাদরাসার উস্তাদগণকে, যারা শুধু পাঠ্যবই নয়, জীবনের মূল্যবান নীতিকথা শিখিয়েছেন। তাদের শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল অনন্য-শিক্ষা যেমন কঠোর, তেমনি প্রেমময়। আমাদের ভুলের প্রতি তারা কখনো রোষ করতেন না, বরং ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের শুদ্ধ পথে ফিরিয়ে আনতেন। তারা আমাদের শিখিয়েছেন সৎ হওয়া, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সর্বদা সত্যের পথে চলা।

প্রিয় শিক্ষক শুধু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করেন না, বরং আমাদের মন এবং হৃদয়কেও বিকশিত করেন। তাদের শিক্ষাই আমাদের জীবনের ভিত্তি, যা ভবিষ্যতের প্রতিটি পদক্ষেপকে দৃঢ় ও সঠিক করে। তাই, শিক্ষককে শ্রদ্ধা জানানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা যেমন তাদের শিক্ষা গ্রহণ করি, তেমনি তাদের সম্মান ও ভালোবাসাও প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য।

শেষে বলতে চাই, শিক্ষক আমাদের জীবনের বাতিঘর। তাদের অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষাই আমাদের অন্ধকারে আলোর মতো পথ দেখায়। প্রতিটি শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য, এবং আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব তাদের প্রতি। প্রিয় শিক্ষক, আপনার শিক্ষা আমাদের জীবনের অমলিন আলো, যা কখনো ম্-ান হবে না। শ্রদ্ধা আপনার প্রতি, প্রিয় শিক্ষক আমাদের, জ্ঞান আলোর প্রদীপ, আপনিই প্রেরক অনন্ত। সদা থাকবেন হৃদয়ে, পথ দেখাবেন সদা, আপনার নৈকট্যে জ্ঞানের খনি, জীবন হবে প্রভা।

আমাদের দেশে শিক্ষকদের বহু অপূর্ণতা রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। রয়েছে নন-এমপিও শিক্ষক এবং কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক। তাদের সুযোগ-সুবিধা ভিন্ন হলেও দায়িত্ব মূলত এক এবং অভিন্ন। প্রধান কাজ হলো, শিক্ষার্থীদের শেখানো। এই কাজের যে চ্যালেঞ্জ, তা স্তর ভেদে ভিন্নতা রয়েছে। তবু এত অপূর্ণতা নিয়ে যে পরিতৃপ্তি শিক্ষকের মধ্যে থাকে, তা হলো শিক্ষা দেওয়ার পরিতৃপ্তি; যা অন্য কোনো পেশায় থাকে না। এ কারণেই শিক্ষকতা পেশা অন্য সব পেশা থেকে একেবারেই ভিন্ন। একজন শিক্ষক তার ছাত্রছাত্রীদের কীভাবে গড়ে তোলেন বা একজন শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর কীরকম সম্পর্ক হয়, তা একজন শিক্ষক ভালো জানেন। সেই কৌশলটি তিনি সময়ের সাথে আয়ত্ত করেন।

এই সমাজ পরিবর্তনের মূল কারিগর শিক্ষকসমাজ। ফলে তাদের জীবনমান উন্নয়নও সবার আগেই প্রয়োজন। শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষার্থী শব্দগুলো পারস্পরিক নির্ভরশীল এবং একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষক বিহীন শিক্ষা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনই শিক্ষার্থীবিহীন শিক্ষাও অর্থহীন। শিক্ষক তার কাছে আসা শিক্ষার্থীদের জীবনে বেঁচে থাকার, জীবন

যুদ্ধে জয়ী হবার মন্ত্র শিখিয়ে দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মনের আবেগ নিয়ন্ত্রণের দীক্ষা দেন। তিনি চান যেন তার শিক্ষাজীবনের সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে বিজয়ী হোক। আবার একজন শিক্ষককে বলা হয় আজীবন ছাত্র। জ্ঞান অন্বেষণে তার তৃষ্ণা অপরিসীম। নিজে না শিখলে অন্যকে কী শেখাবেন। তাইতো তাকে পড়তে হয়, জানতে হয় এবং জানাতে হয়। এই জানানোর কাজটি হচ্ছে শিক্ষকতার জীবনের সব থেকে পরিশ্রমী এবং কঠিন কাজ। কারণ তার জানানোর কাজটি সফল হয়েছে কি না, তা বুঝতে পারাও একটি বড় দক্ষতার ব্যাপার।

একজন শিক্ষক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে পরামর্শক হওয়ার, শিক্ষাসহায়ক ব্যক্তি, শিক্ষক নিজেই শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর উন্নয়ন সাধন করবেন, তার আচরণ হবে রোলমডেল, তিনি সমাজের দর্পণ, কারিকুলাম প্রস্তুতকারক ও মূল্যায়ণকারণ, শিক্ষা সংগঠক এবং নির্দেশক ইত্যাদি গুণাবলি সম্পূর্ণ মানুষ। সত্যি কথা বলতে একদিক থেকে শিক্ষক একজন সত্যিকারের অতিমানব, যাদের থাকে সহজেই আকৃষ্ট করার ক্ষমতা। আবার একদিক থেকে শিক্ষকরা খুব সাধারণ একজন মানুষ, যারা তৈরি করেন অসাধারণ সব মানুষ।

শিক্ষা কোনো পেশা নয় বরং একটি সেবা। সমাজে অনেক সেবামূলক কাজ রয়েছে। এর মধ্য শিক্ষা অন্যতম। শিক্ষা হচ্ছে একটি ব্রত। যে ব্রত দিয়ে তিনি তার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটান। শিক্ষকের এই কাজটির সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে রয়েছে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ।

বছরের পর বছর পাশ করিয়ে রেজাল্ট ভালো করাতে পারলেই কিন্তু শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং দায়িত্ব তো প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো। একজন শিক্ষকই যা আবিষ্কার করতে পারেন এবং তা ব্যবহারে পথ দেখাতে পারেন। তবে বর্তমানে গুটিকয়েক শিক্ষকের কর্মকাণ্ডে প্রায়ই এ পেশা সমালোচিত হয়। কিন্তু গুটিকয়েক উদাহরণ থেকে সার্বিক মূল্যায়ন করাটা বোকামি। শুধু পেশায় নিয়োজিত হলেই শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষক হতে হলে তার সম্পর্কিত গুণাবলি অর্জন করতে হবে। শুধু পোশাকে বা পেশায় শিক্ষক হয়ে কী লাভ?

বাবা-মা যেমন সন্তানের বুকের ভেতর বেঁচে থাকে, ঠিক তেমন করেই শিক্ষক বেঁচে থাকেন তার শিক্ষার্থীর মধ্যে। আমার অনেক শিক্ষক যেমন আজও বেঁচে আছেন আমার মধ্যে। শিক্ষক হিসেবে একজন মানুষ কখন সফল তা নির্ণয় করা তার চাকরির বয়সের উপর নির্ভর করে না। বরং সেই শিক্ষক কতজন শিক্ষার্থীর ভেতর নিজের আদর্শ প্রভাবিত করতে পারছেন, কতজনকে মানুষ হওয়ার সঠিক পথ দেখাতে পেরেছেন, তার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষক বেঁচে থাকেন শিক্ষার্থীর মধ্যে। মানুষ হওয়ার সেই মন্ত্র একমাত্র শিক্ষকের ভেতরেই থাকে। একজন শিক্ষার্থী শিক্ষক সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করার সুযোগই পাওয়া উচিত না। কারণ যে প্রকৃত শিক্ষক সে কোনদিন কোনো একজন শিক্ষার্থীর জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এমন কিছু করেন না।

শিক্ষকতা পেশায় থাকলেই কি প্রকৃত শিক্ষক হওয়া যায়! এটাও একধরনের প্রাণান্ত চেষ্টার ফল। শিক্ষক এবং সমাজের অন্য পেশার মানুষের সাথে পার্থক্য রয়েছে। অন্য অনেকে যা পারে, শিক্ষকরা সেটা পারে না। তাকে এত এত গুণের সমাবেশ ঘটাতে হয় যে, একজন অতিমানবেরও বুঝি এত ক্ষমতা থাকে না। সেজন্য শিক্ষকতাকে পেশা না বলে সেবা বলা হয়। বর্তমান সরকার শিক্ষকদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। একের পর এক দাবি পূরণ করে তার প্রমাণ দিয়েছে। হাজার হাজার রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের মতো বড় কাজ এই সরকারের সময়েই সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণের মতো বড় কাজ করেছেন।

একজন শিক্ষককে বলা হয় আজীবন ছাত্র। জ্ঞান অন্বেষণে তার তৃষ্ণা অপরিসীম। নিজে না শিখলে অন্যকে কী শেখাবেন। তাইতো তাকে পড়তে হয়, জানতে হয় এবং জানাতে হয়। এই জানানোর কাজটি হচ্ছে শিক্ষকতার জীবনের সব থেকে পরিশ্রমী এবং কঠিন কাজ। কারণ তার জানানোর কাজটি সফল হয়েছে কি না তা বুঝতে পারাও একটি বড় দক্ষতার ব্যাপার। একজন শিক্ষক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে পরামর্শক হওয়ার, শিক্ষাসহায়ক ব্যক্তি, শিক্ষক নিজেই শিক্ষাসহায়ক সামগ্রীর উন্নয়ন সাধন করবেন, তার আচরণ হবে রোল মডেল, তিনি সমাজের দর্পণ,

কারিকুলাম প্রস্তুতকারক ও মূল্যায়ণকারণ, শিক্ষা সংগঠক এবং নির্দেশক ইত্যাদি গুণাবলি সম্পূর্ণ মানুষ। সত্যি কথা বলতে একদিক থেকে শিক্ষক একজন সত্যিকারের অতিমানব, যাদের থাকে সহজেই আকৃষ্ট করার ক্ষমতা। আবার একদিক থেকে শিক্ষকরা খুব সাধারণ একজন মানুষ, যারা তৈরি করেন অসাধারণ সব মানুষ। শিক্ষা কোনো পেশা নয় বরং একটি সেবা। সমাজে অনেক সেবামূলক কাজ রয়েছে। এর মধ্য শিক্ষা অন্যতম। শিক্ষা হচ্ছে একটি ব্রত। যে ব্রত দিয়ে তিনি তার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটান। শিক্ষকের এই কাজটির সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্যে রয়েছে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ।

বাস্তবে বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশের শিক্ষকসমাজ আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। কারণ পাশ করা সার্টিফিকেটের জোরে যে-কেউ শিক্ষকতা পেশায় ঢুকে পড়ছে কিন্তু সেই ব্যক্তি শিক্ষক হিসেবে কেমন তা যাচাই করার কোনো উপায় নেই। একজন শিক্ষক অবশ্যই সৎ ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবেন। কিন্তু সার্টিফিকেট মেধার মূল্যায়ন করলেও মনুষ্যত্বের মূল্যায়নের ক্ষমতা রাখে না। ফলে শিক্ষকতা পেশায় থেকেও নানা অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। এবং এজন্য শিক্ষকসমাজের প্রতি আঙুল উঠছে। শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতনস্কেল দরকার, কারণ শিক্ষকদের দায়িত্ব অন্য সব পেশা থেকে ভিন্ন। তা ছাড়া শিক্ষকতা হলো সেই পেশা, যেখান থেকে দেশের মেধা তৈরি হয়। ফলে আর সব পেশার সাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। তাই এই পেশার সাথে জড়িত মানুষগুলো আলাদা বেতনস্কেল দাবি করতেই পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষকতা পেশায় কারা আসে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, মেধার ভিত্তিতে যদি ভাগ করা হয়, তাহলে উচ্চ মেধা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা কমই শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। প্রথম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বপ্নকে বেঁধে রাখে বিসিএস, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা এরকম কোনো পেশায়, যেখানে প্রচুর টাকা কামানোর পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক সম্মান। এরপরের মেধাবী রয়েছে তারা প্রথম শ্রেণিতে না পরলেও দ্বিতীয় শ্রেণির মেধাবী। তারা ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরি খোঁজে। এরপর যারা থাকে, তারা

অন্য পেশার সাথে শিক্ষকতা পেশায় আসে।

এখন কথা হলো কেন রাষ্ট্রের সব থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক এমনকি কলেজে আসতে অনীহা। কেন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়াতে বেশি আগ্রহী। এর একটাই অর্থ যে, প্রাথমিক বা বেসরকারি স্কুল-কলেজের চাকরি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির নয়। ফলে প্রথম শ্রেণি বা দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরি খোঁজা একজন মেধাবী কেন শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেবে? অনেক উন্নত দেশেই প্রাথমিক শিক্ষকদের মানে শিক্ষকদেরই মর্যাদা সর্বাধিক। তাদের বেতন ও সুযোগ সুবিধাও বেশি। বড় বড় চাকরি ছেড়ে তাদের প্রধান লক্ষ্যই হয় শিক্ষকতা করা।

এক্ষেত্রে চূড়ান্ত মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এটা ঘটছে না। বড় বড় ইঞ্জিয়াররা বড় বড় দালানকোঠা, বিল্ডিং তৈরি করেন। তবে এসবের থেকেও যা আজ বেশি দরকার, তা হলো মানুষ। একমাত্র শিক্ষকরাই সে কাজটি করতে সক্ষম।

শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

● প্রবন্ধ

শিক্ষকতা: পরকালীন পুঁজি

— হাসান জামিল

মানুষের জীবন নদীর স্রোতের মতো। কখন কার তীর ভাঙবে, কার স্রোত থেমে যাবে, তা কেবল রব্বুল আলামিনের জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ। কেউ ফুলের মতো শুরুতেই ঝরে যায়, কেউ যৌবনের রঙিন প্রান্তরে হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, আবার কেউ বার্ধক্যের অক্ষমতা নিয়েই দীর্ঘজীবন পাড়ি দেয়।

শিশু-কিশোরদের গুনাহ থাকে না, থাকলেও সামান্য। বৃদ্ধরা তওবা করার যথেষ্ট সময় পান। কারও আবার 'সদকায়ে জারিয়া' ব্যবস্থা করারও সুযোগ হয়। কিন্তু যারা যৌবনের প্রারম্ভেই বিদায় নেয়, তাদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। একদিকে যৌবন গুনাহের ঝুঁকিতে ভরা। অন্যদিকে 'সদকায়ে জারিয়া' ব্যবস্থা করার মতো সম্পদ থাকে না। থাকে না দুআ করার মতো সন্তান-সন্ততি। বাবা-মা, ভাই-বোন আর ক'দিন?

দাওরায়ে হাদিসের সময় এবিষয়গুলো আমায় ভাবাতো। ভাবতাম, আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আমার জন্য কবরে নেকি পাঠাবে কে? গফফারের দরবারে আমার জন্য হাত ওঠাবে কে? কী হবে আমার নাজাতের ওসিলা? সেই চিন্তা থেকেই হৃদয়ে জন্ম নেয় এক স্বপ্ন, আমি শিক্ষক হব। এমন ছাত্র গড়ে তুলব, যারা আমার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অন্যদের কাছে তা পোঁছে দেবে। তারা আবার ছড়িয়ে দেবে পৃথিবীর

দিগদিগন্তে। এভাবেই জ্ঞানের মশাল এক হাত থেকে অন্য হাতে পৌঁছে যাবে। আর আমি কবরে সেই আলোয় স্নাত হব। রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন 'মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনটি আমল চলমান থাকে। সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।'

আলহামদুলিল্লাহ, আজ চার বছর হলো আমি শিক্ষকতা করছি। প্রথম বছর থেকেই আমি গুনে রাখতাম, আমার হাতে কতজন ছাত্র পড়ছে, তাদের মধ্যে কতজন ভবিষ্যতে শিক্ষক হবে, তারা আবার নতুন প্রজন্মকে পড়াবে। এ এক অবিরাম স্রোত, যার ফল্গুধারায় আমার মৃত্যুর পরও সওয়াব প্রবাহিত হবে।

আমরা যারা কওমি মাদরাসার শিক্ষক, আমাদের জীবনে ব্যাংক ব্যালেন্স বা আর্থিক সচ্ছলতা নেই। যেখানে প্রতিদিনের আহার জোগাড় করাটাই সংগ্রামের বিষয়, সেখানে অর্থ জমা রাখা কেবল স্বপ্ন। আমাদের প্রকৃত পুঁজি হলো তালিবুল ইলমগণ। মৃত্যুর পরও যখন তারা কুরআন-হাদিসের আলো ছড়াবে, আমল করবে এবং অন্যকে শিক্ষা দেবে, তখনই আমাদের কবরে নুরের ঝলকানি ছড়াবে। আমাদের আত্মা প্রশান্ত হবে।

একদিন আমরা সবাই এ দুনিয়ার কোলাহল ছেড়ে চলে যাব। তখন না থাকবে নাম-যশ, না থাকবে অর্থসম্পদ। থাকবে কেবল সেই আমল, যা অন্যের হৃদয়ে রেখে গিয়েছি। শিক্ষকতার মাধ্যমে যে জ্ঞান আমরা তালিবুল ইলমের মাঝে ছড়িয়ে দিই, তা-ই হবে আমাদের চলমান সওয়াবের ধারা। সদকায়ে জারিয়া।

হয়তো আমাদের কবরের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে দূরদেশের কারও তেলাওয়াত, কোনো তালিবুল ইলমের একখানা দুআ, কিংবা কোনো মুমিনের একটি নেক আমল আলো হয়ে ঝলমল করবে। তখন মনে হবে, হায়! এই সামান্য শিক্ষকতাই ছিল আমার প্রকৃত ধনভান্ডার, আমার পরকালীন পুঁজি।

উস্তাদ: জামিয়া নিযামিয়া ডেমরা, ঢাকা

● প্রবন্ধ

নীরব নির্মাতা

সারজিয়া আফরিন তিসি

শিশু জন্ম নেয় এক অনিশ্চিত জগতে, যেখানে আলো-অন্ধকারের পার্থক্য সে জানে না, জানে না কোন পথটি তার জন্য। তখনই এক আলোকবর্তিকা হয়ে এগিয়ে আসেন একজন মানুষ–শিক্ষক। তিনি শুধু পাঠদাতা নন, তিনি একজন দিশারি, একজন নির্মাতা, একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর হাত ধরেই শুরু হয় জীবনের যাত্রা, শুরু হয় জ্ঞানের পথে হাঁটার প্রথম পদক্ষেপ।

শিক্ষক মানেই যেন এক আশ্রয়স্থল, যেখানে প্রশ্নের উত্তর আছে, ভুলের সংশোধন আছে, আর আছে ভালোবাসার এক নিঃস্বার্থ ছায়া। তিনি আমাদের শেখান কেবল অক্ষর নয়, শেখান অনুভব করতে, ভাবতে এবং সবচেয়ে বড় কথা–মানুষ হতে।

আমার প্রথম শিক্ষক ছিলেন মা। তাঁর কণ্ঠে শুনেছি 'অ আ ক খ', তাঁর চোখে দেখেছি ভালোবাসার গভীরতা। কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রথম পা রাখার দিন, যেদিন সাদা শাড়ি পরা এক নারী আমার হাতে খাতা-কলম তুলে দিয়েছিলেন, সেদিন বুঝেছিলাম–শিক্ষক মানে শুধু পাঠ শেখানো নয়, তিনি একজন শিল্পী, যিনি আমাদের মনকে গড়ে তোলেন।

প্রত্যেক শিক্ষক যেন একেকটি কবিতা। কেউ কঠোর, কেউ কোমল, কেউ হাস্যরসিক, কেউ গম্ভীর। কিন্তু প্রত্যেকেই আমাদের জীবনের একেকটি অধ্যায়। তাঁদের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি

দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে, আমাদের আত্মাকে জাগ্রত করে। একজন শিক্ষক যখন বলেন, 'তুমি পারবে', তখন সেই শব্দগুলো শুধু উৎসাহ নয়, তা হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি। যখন তিনি বলেন, 'ভুল করেছ, আবার চেষ্টা করো', তখন সেই বাক্য হয়ে ওঠে জীবনের পাঠ। তাঁর চোখে আমরা দেখি সম্ভাবনার আকাশ, তাঁর হৃদয়ে আমরা খুঁজে পাই নির্ভরতার ভূমি। আমার জীবনে এমন একজন শিক্ষক ছিলেন, যিনি শুধু পাঠ শেখাননি, শেখিয়েছেন কীভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়। তিনি বলতেন, 'জীবন মানে শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল নয়, জীবন মানে নিজের ভিতরকে চিনে নেওয়া।' তাঁর সেই কথাগুলো আজও আমার অন্তরে বাজে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে তাঁর ছায়া খুঁজে পাই।

শিক্ষক আমাদের শেখান কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়। তিনি আমাদের শেখান, কীভাবে নিজের অবস্থানকে বুঝে নিতে হয়। তাঁর পাঠে থাকে ইতিহাসের ধ্বনি, সাহিত্যের সৌন্দর্য, বিজ্ঞানের যুক্তি, আর জীবনের গভীরতা। তিনি আমাদের চোখ খুলে দেন, দেখান এমন এক জগৎ, যা আমরা আগে দেখিনি।

শিক্ষকের কাছে আমরা শিখি শ্রদ্ধা, শিখি সহানুভূতি, শিখি সহনশীলতা। তিনি আমাদের শেখান, কীভাবে ভিন্নমতকে গ্রহণ করতে হয়, কীভাবে নিজের মতকে গঠন করতে হয়। তাঁর পাঠে থাকে মানবতার বীজ, যা একদিন মহিরুহ হয়ে ওঠে।

তিনি আমাদের শেখান, কীভাবে ব্যর্থতাকে গ্রহণ করতে হয়, কীভাবে সাফল্যকে বিনয়ীভাবে ধারণ করতে হয়। তাঁর শিক্ষা শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ নয়, তা ছড়িয়ে পড়ে জীবনের প্রতিটি বাঁকে। তিনি আমাদের শেখান, কীভাবে নিজের ভুলকে স্বীকার করতে হয়, কীভাবে অন্যের সাফল্যে আনন্দিত হতে হয়।

আজকের এই সংখ্যায়, যখন আমরা শিক্ষককে উৎসর্গ করছি, তখন মনে পড়ছে সেইসব মুহূর্ত, যখন ক্লাসে বসে তাঁর কণ্ঠে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ। মনে পড়ছে সেইসব দিন, যখন তিনি আমাদের বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ একদিন বড় লেখক হবে, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ শিক্ষক।' তাঁর সেই বিশ্বাসই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

শিক্ষক মানে শুধু একজন ব্যক্তি নয়, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর চরিত্র, তাঁর

জীবনদর্শন, তাঁর আচরণ সবকিছুই আমাদের গড়ে তোলে। তিনি ছিলেন নীরব, কিন্তু তাঁর প্রভাব ছিল গভীর। তিনি ছিলেন দৃশ্যপটের বাইরে, কিন্তু প্রতিটি সাফল্যের পেছনে ছিলেন তিনি। তাঁর নিঃস্বার্থ পরিশ্রম, তাঁর অগাধ ধৈর্য, তাঁর ভালোবাসা সবকিছুই আমাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ। তিনি ছিলেন সেই মানুষ, যাঁর ছায়ায় আমরা বেড়ে উঠেছি, যাঁর আলোয় আমরা পথ খুঁজে পেয়েছি।

তাই আজ, এই বিশেষ সংখ্যায়, আমরা তাঁদের প্রতি নিবেদন করছি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা। তাঁদের জন্য রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, আর একটুকু কবিতা-

নীরব ছিলেন, তবু ছিলেন সবটুকু আলো,
তাঁর ছায়ায়ই শিখেছি চলার পালো।
স্বপ্নের বীজ বুনেছেন নিঃশব্দ হাতে,
তাঁর স্পর্শেই জীবন জেগেছে প্রাতে।
তাঁর আলো নিভে যায় না কখনো,
তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্বলে ওঠে নতুন দীপশিখা হয়ে।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বিশ্বজুড়ে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ওহভড়ৎসধঃরড়হ ধহফ ঈড়সসঁহরপধঃরড়হ ঞবপযহড়ষড়মু - ওঈঞ)। এই ডিজিটাল বিপ্লবের ঢেউ শিক্ষার চিরাচরিত পদ্ধতি ও কাঠামোর ওপর আছড়ে পড়েছে। যার ফলস্বরূপ ক্লাসরুমের পরিবেশ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা এখন আর কেবল জ্ঞানের প্রথাগত সঞ্চারকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং তিনি এখন হয়ে উঠেছেন একজন সহযোগী, পথপ্রদর্শক এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিখন পরিবেশের পরিচালক। তবে, এই পরিবর্তন শিক্ষকসমাজের সামনে এনেছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ, যা মোকাবিলা করে শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মান নিশ্চিত করাই হলো বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা অনেক। গতানুগতিক শিক্ষাদানের মডেল থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষককে

এখন বেশ কয়েকটি নতুন দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। যেমন:

১. জ্ঞান-উৎস থেকে নির্দেশক: ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানের প্রধান ও একমাত্র উৎস। ডিজিটাল যুগে ইন্টারনেট ও সার্চ ইঞ্জিনের সহজলভ্যতার কারণে জ্ঞান এখন হাতের মুঠোয়। তাই শিক্ষকের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'পাশের পথপ্রদর্শক' হিসেবে। শিক্ষক এখন শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে, গবেষণা করতে এবং নিজস্ব অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উৎসাহিত করেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বিকাশে জোর দেন।

ইন্টারনেটে তথ্যের প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু সেই তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য, তা যাচাই করা জরুরি। শিক্ষককে এখন শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং মানসম্মত ডিজিটাল শিক্ষণ উপাদান বাছাই করে দিতে হয়। তিনি শিক্ষার্থীদের শেখান কীভাবে তথ্য যাচাই করতে হয় এবং ডিজিটাল বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হয়।

২. ব্যক্তিগতকৃত শিখন পরিবেশের নির্মাতা: ডিজিটাল টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, গতি এবং শেখার ধরন অনুযায়ী পাঠদান পদ্ধতিকে সাজাতে পারেন। যা গতানুগতিক ক্লাসরুমে প্রায় অসম্ভব ছিল। লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক অ্যাপ শিক্ষকের হাতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি এবং পারফরম্যান্সের ডেটা তুলে দেয়। এই ডেটা ব্যবহার করে শিক্ষক দুর্বলতা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী বিশেষ সহায়তা দিতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষামূলক সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে এমন শিখন অভিজ্ঞতা তৈরি করেন, যা শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান বা দক্ষতার স্তরের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাপ খাইয়ে নেয়। ফলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা বাড়তি সহায়তা পায় এবং এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা আরও গভীরে শিখতে পারে।

৩. ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাতা ও প্রয়োগকারী: আধুনিক শিক্ষণ-শেখানো প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার জন্য শিক্ষককে এখন ডিজিটাল কনটেন্টের স্রষ্টা ও সফল প্রয়োগকারী হতে হয়। শিক্ষককে প্রেজেন্টেশন স্লাইড, শিক্ষামূলক ভিডিও, পডকাস্ট এবং ইন্টারেক্টিভ কুইজ তৈরির মতো দক্ষতা অর্জন করতে হয়। ভিডিও ক্লাস ও ভার্চুয়াল ল্যাবের মাধ্যমে তিনি বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করে তোলেন।

শিক্ষক গুগল ক্লাসরুম, জুম বা অন্যান্য প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে দূরবর্তী বা মিশ্রিত শিখন পরিবেশ পরিচালনা করেন। অনলাইন আলোচনা, ব্রেকআউট রুম এবং ডিজিটাল হোয়াইটবোর্ডের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা তাঁর দায়িত্ব।

৪. ডিজিটাল নাগরিকত্বের শিক্ষাগুরু: শিক্ষার পাশাপাশি একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিজিটাল নৈতিকতা ও নিরাপত্তার বোধ জাগ্রত করতে হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেটের ঝুঁকি (সাইবার বুলিং, ফিশিং, হ্যাকিং) সম্পর্কে সচেতন করেন এবং অনলাইন পরিবেশে দায়িত্বশীল আচরণ করতে শেখান। একবিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হলো যোগাযোগ, সহযোগিতা, সৃজনশীলতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বিকাশে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শিক্ষক উৎসাহিত করেন।

শিক্ষকের ভূমিকা যতটাই গুরুত্বপূর্ণ, চ্যালেঞ্জগুলো ঠিক ততটাই কঠিন। এই চ্যালেঞ্জগুলো তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: প্রযুক্তিগত, কাঠামোগত এবং মনস্তাত্ত্বিক।

১. প্রযুক্তিগত ও সক্ষমতা বিষয়ক চ্যালেঞ্জ: ডিজিটাল ডিভাইস ও সফটওয়্যার পরিচালনায় বহু শিক্ষকের, বিশেষত অপেক্ষাকৃত প্রবীণ শিক্ষকদের পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব রয়েছে। নিয়মিত ব্যবহার ও আপডেটের সুযোগ না পাওয়ায় তাঁরা পিছিয়ে পড়েন। প্রযুক্তির দ্রুত বিবর্তনশীল গতি শিক্ষককে একটি নিরন্তর শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে ঠেলে দেয়। নতুন প্ল্যাটফরম, সফটওয়্যার ও শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে সবসময় ওয়াকিবহাল থাকা অত্যন্ত কঠিন। উচ্চ মানসম্মত, সৃজনশীল ও ত্রুটিমুক্ত ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা একটি সময়সাপেক্ষ ও দক্ষতা-নির্ভর কাজ। সব শিক্ষকের পক্ষে পর্যাপ্ত রিসোর্স ও সময় নিয়ে এটি করা সম্ভব হয় না।

২. কাঠামোগত ও লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ: প্রত্যন্ত বা গ্রামীণ অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসম্মত কম্পিউটার ল্যাব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, উচ্চ গতির ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগের চরম ঘাটতি রয়েছে। ডিজিটাল বিভাজন সবচেয়ে বড়

সামাজিক-শিক্ষাগত চ্যালেঞ্জ। সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের অনেক শিক্ষার্থীর কাছে ডিজিটাল ডিভাইস (স্মার্টফোন, ল্যাপটপ) বা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই। ফলে ডিজিটাল শিক্ষণ পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য আরও গভীর হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেওয়া প্রযুক্তিসামগ্রীর (কম্পিউটার, প্রজেক্টর) নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও ত্রুটি সারানোর জন্য প্রশিক্ষিত কারিগরি কর্মীর অভাব একটি নিত্যদিনের সমস্যা। অযত্ন ও অবহেলায় অনেক মূল্যবান সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে যায়।

৩. মনস্তাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ: অনেক শিক্ষকের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ বা দ্বিধা কাজ করে। তাঁরা গতানুগতিক পদ্ধতির স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বের হতে চান না। পাঠদান, প্রশাসনিক দায়িত্ব, নতুন সিলেবাসের প্রস্তুত এসবের পাশাপাশি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও অনলাইন প্ল্যাটফরম পরিচালনা করা শিক্ষকের ওপর মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে। দূরশিক্ষণ বা অনলাইন পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের সততা বজায় রাখা একটি জটিল চ্যালেঞ্জ। নকল প্রতিরোধ ও মূল্যায়নের যথার্থতা নিশ্চিত করতে শিক্ষককে নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে ডিজিটাল যুগে সফল হওয়ার জন্য শিক্ষক, সরকার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সকলেরই সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

শিক্ষকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রশিক্ষণ কেবল প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা ডিজিটাল শিক্ষণ-শেখানো কৌশল, ডেটা বিশ্লেষণ এবং অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা দেবে। 'শিক্ষক বাতায়ন' বা 'মুক্তপাঠ'-এর মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষকদের স্ব-প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করতে হবে।

সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চ গতির ইন্টারনেট এবং আধুনিক ডিজিটাল সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্য স্বল্পমূল্যের ডিভাইস এবং ডেটা প্যাকেজের ব্যবস্থা করে ডিজিটাল বিভাজন কমাতে হবে। সেই

সাথে প্রযুক্তি সরঞ্জামের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টেকনিশিয়ান ও প্রশিক্ষিত জনবলের ব্যবস্থা করা জরুরি। ডিজিটাল শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য শিক্ষকদের মানসিক প্রস্তুতি তৈরিতে সহায়তা করতে হবে। নতুন পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাঁদের কাজের চাপ কমানোর জন্য প্রশাসনিক সহযোগিতা দিতে হবে। শিক্ষকদের ডিজিটাল উদ্ভাবনের জন্য পুরস্কৃত করার মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে নতুন কিছু করার আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। ডিজিটাল যুগ শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, যেখানে শিক্ষকের ভূমিকা কেবল তথ্য সরবরাহকারীর নয়, বরং তিনি একজন উদ্ভাবক, সংযোগ স্থাপনকারী এবং অনুপ্রেরণাদাতা।

প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিখন প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয়, কার্যকর এবং ব্যক্তিগতকৃত করার অপার সুযোগ তৈরি হয়েছে। যদিও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, কাঠামোগত দুর্বলতা এবং ডিজিটাল বৈষম্যের মতো বড় চ্যালেঞ্জগুলো এখনও বিদ্যমান, তবে শিক্ষক, সরকার ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই বাধাগুলো অতিক্রম করা সম্ভব।

আজকের শিক্ষককে তাঁর চিরাচরিত গণ্ডি পেরিয়ে একজন ‘নেটওয়ার্ক শিক্ষক’ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে, যিনি বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন এবং একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

শিক্ষার্থী, গণিত বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

মানবগঠনের কারিগর

তোফায়েল আরিফ

শিক্ষক তিনি শুধু পাঠদানকারী নন, তিনি মানবগঠনের কারিগর। সমাজের প্রতিটি উন্নতির পেছনে একজন শিক্ষকের হাতছোঁয়া লুকিয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে যত মহান মানুষ, যত প্রজ্ঞাবান মনীষী, তাঁদের পেছনে ছিলেন কোনো না কোনো শিক্ষক, যিনি তাঁদের চিন্তায়, চরিত্রে ও নীতিতে রেখেছেন অমোচনীয় ছাপ।

মানুষ জন্মগতভাবে নির্দোষ ও অপূর্ণ। শিক্ষা তাকে করে তোলে সচেতন, পরিপূর্ণ, আর সেই শিক্ষার প্রধান উৎস হচ্ছেন শিক্ষক। শিক্ষকের কাছ থেকেই শেখা যায় কেবল জ্ঞান নয়, শেখা যায় জীবনবোধ নৈতিকতা সত্য ও সৌন্দর্যের উপলব্ধি।

শিক্ষক মানবতার স্থপতি: একজন শিক্ষক সমাজে এমন এক ভূমিকা রাখেন, যা অনেক সময় অদৃশ্য হলেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে প্রজন্মকে। তিনি ছাত্রকে বইয়ের অক্ষর শেখান ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও বড় শিক্ষা দেন কীভাবে মানুষ হতে হয়। যিনি নিজের আলো দিয়ে অন্যকে আলোকিত করেন, তিনি-ই প্রকৃত শিক্ষক। প্রাচীন যুগে শিক্ষক বা গুরু ছিলেন সমাজের জ্ঞানভান্ডার। তাঁদের কাছে শিষ্যরা শুধু পাঠ্য জ্ঞানই নয় জীবনের অর্থও শিখত। আজও সেই ভাবধারা বর্তমান সময় বদলেছে, মাধ্যম বদলেছে কিন্তু শিক্ষকের গুরুত্ব চিরকালীন।

সময়ের পরিবর্তনে শিক্ষকের ভূমিকা: প্রযুক্তির এই যুগে জ্ঞানের উৎস সীমাহীন কিন্তু সেই জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহারের শিক্ষা দেন শিক্ষকই। ইন্টারনেট আমাদের তথ্য দেয় কিন্তু বিচারবোধ শেখায় না। রোবট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, কিন্তু উৎসাহ দিতে পারে না।

শিক্ষকই জানেন কখন একটি কিশোরকে অনুপ্রাণিত করতে হয়, কখন কঠোরভাবে পথ দেখাতে হয়, কখন ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরতে হয়।

সমাজে শিক্ষকের প্রভাব: শিক্ষক শুধু স্কুলের ভেতরে নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রভাব রাখেন। তাঁর তৈরি ছাত্ররাই হয় ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও নেতা। তিনি সমাজকে দেন নৈতিক ভিত্তি, সংস্কৃতির ধারা, আর জাতিকে দেন দিকনির্দেশনা।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজ অনেক জায়গায় শিক্ষকদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। তাঁদেরকে কেবল চাকরিজীবী মনে করা হয়। অথচ তাঁরা জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন। তাঁদের অবদান অদৃশ্য হলেও অমূল্য। তাই সমাজের প্রতিটি নাগরিকের উচিত শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা।

ইতিহাসের আলোয় শিক্ষক: বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষী শিক্ষকের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে মহান ব্যক্তিত্বরা। নবি করিম সা. নিজেই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন আরবসমাজে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক: একজন শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্ক কেবল জ্ঞানের নয়, তা আত্মিক বন্ধনেরও। একজন ভালো শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে শুধু ভালো নম্বর পাওয়ার পথে পরিচালিত করেন না, বরং জীবনের বাস্তবতা বোঝাতে সাহায্য করেন। তিনি ভুলকে দেখান শিক্ষা হিসেবে ব্যর্থতাকে দেখান সম্ভাবনা হিসেবে।

যেখানে এই সম্পর্ক সম্মান ও ভালোবাসার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে গড়ে ওঠে এক আলোকিত প্রজন্ম। একজন শিক্ষক জাতির নির্মাতা মানবগঠনের কারিগর। তাঁর হাতেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বীজ বপন হয়। তাঁর স্পর্শেই অন্ধকার মন জেগে ওঠে আলোয় তাঁর দিকনির্দেশনাতেই এক শিশু হয়ে ওঠে সচেতন নাগরিক।

তাই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, তাঁদের অবদান স্মরণ রাখা, আর তাঁদের আলোয় নিজেদের পথ আলোকিত করা। কারণ, যে জাতি শিক্ষককে সম্মান করে, সেই জাতিই আলোকিত হয়।

শিক্ষার্থী, সদর, ময়মনসিংহ

• প্রবন্ধ

শিক্ষক যখন জীবনের লক্ষ্য দেখায়

লাবনী আক্তার কবিতা

‘তিনজনই পারেন একটি দেশ বা জাতিকে বদলাতে। তারা হলেন বাবা, মা ও শিক্ষক।’ এপিজে আবদুল কালাম ছাত্ররা যদি দেশ গড়ার হাতিয়ার হয়ে থাকে, তাহলে বলা যায় শিক্ষকগণ হলেন সেই হাতিয়ার তৈরির কারিগর। বর্তমানে যেখানে শিক্ষা একটি ব্যবসা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে, সেখানে এমন কিছু শিক্ষক আছেন, যারা শুধু পড়ানোই নয় বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা সৃষ্টি করছেন।

তারা বারবার প্রমাণ করছেন যে, একজন শিক্ষকের কাজ শুরু পড়ানোতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং শিক্ষার্থীদের সঠিক মানুষ হিসেবে তৈরি করা। তাইতো এই সকল শিক্ষক আমাদের মনে জায়গা করে নেন। হয়ে যান আমাদের প্রিয় শিক্ষক। তাই সকল শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানিয়ে আজকে আমার প্রিয় শিক্ষকের কথাই বলব।

আমার নাম লাবনী আক্তার কবিতা। মানুষের ছোটবেলায় অনেক কিছু হওয়ার স্বপ্ন থাকে, কিন্তু আমার এরকম কিছু ছিল না। আর না তো আমার কোনো প্যাশন ছিল। আমি শুধু এগিয়ে যাচ্ছিলাম, সময়ের মতো, যার কোনো লক্ষ্য নেই। আজকের গল্পটা ২০১৭ সালের ঘটনা। আমি সবে মাত্র হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছি। নতুন স্কুল, কারও সাথেই তেমন পরিচয় হয়নি। তবে নতুন স্কুলে আমার সবচেয়ে পছন্দের ছিল আমার শ্রেণি শিক্ষিকা, তাঁর নাম রঞ্জনা বড়ুয়া, বিখ্যাত কবি সুকুমার

বড়ুয়ার মেয়ে। ম্যাম দেখতে ভীষণ সুন্দর, আর ভীষণ কোমল মনের মানুষ; আমাকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন ক্লাসে হাজিরা নেওয়া হচ্ছিল। যেহেতু নতুন ক্লাস, তাই রোলের সাথে সবার পুরো নাম ডাকা হচ্ছিল। আমার রোল ছিল ১০।

ম্যাম ডাকলেন: রোল দশ, লাবনী আক্তার কবিতা। আমি কিছু বলার আগেই ম্যাম বলে উঠলেন, এই তোমার নাম কবিতা, তাহলে তুমি কবিতা লিখবে।' আগেই বলেছি, আমার কোনো লক্ষ্য, প্যাশন কিছুই নেই। পড়াশোনা ছাড়া নিতান্ত কোনো কাজও করতে হয় না। তাই ভাবলাম, ম্যাম যখন বলেছেন, তাহলে লেখা-ই যায়, চেষ্টা করে দেখি, ম্যাম খুশি তো হবেন।

তাই লিখে ফেললাম কবিতা। জীবনের প্রথম কবিতাটা ম্যামকে নিয়েই লেখলাম। ম্যাম দেখলেন, প্রশংসা করলেন। ব্যাপারটা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারত অথবা গতানুগতিক শিক্ষক হলে এখানেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু ব্যাপারটার বিস্তৃতি ছিল বহুদূর।
একদিন ম্যাম আমাকে অফিসে ডেকে একটা ফরম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা পূরণ করো, কবিতাটা কাগজে লিখে, খামে করে, পত্রিকার অফিসে পাঠিয়ে দাও।' পত্রিকার অফিসের ঠিকানাটাও লিখে দিলেন।
মনে মনে বললাম, 'ধুর! কোথায় ফেঁসে গেলাম।' তারপর বাসায় এসে অনেক চিন্তা করে, ম্যামের কথামতো পাঠিয়েই দিলাম। শুধু ম্যামের কথা রাখতেই পাঠিয়েছিলাম। অন্য কোনো আশা বা উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

একদিন দুপুরে স্কুল বন্ধ, আরাম করে ঘুমাচ্ছি, এমন সময় ম্যাম কল দিলেন। ধরলাম, ওপাশ থেকে ম্যাম বললেন, 'লাবনী তোমার কবিতা তো পেপারে বের হয়েছে।' ম্যামের কথাটা আমার বিশ্বাস করতেই অনেক সময় লাগল, প্রথমে ভাবলাম হয়তো স্বপ্নই দেখছি। কিন্তু তখন কী জানতাম হাতের মুঠোয় স্বপ্ন পেয়েছি।
এরপর থেকে ম্যাম আমাকে লেখায় উৎসাহ দিলেন। আমি আরও লিখতাম, কবিতা প্রকাশিত হতো, একটা সময় লেখালেখি আমার নেশা হয়ে গেল। লক্ষ্যহীন জীবনে লেখালেখিকেই একটা লক্ষ্য হিসেবে নিলাম। তাইতো আজও লিখে চলছি।

দুনিয়াতে নামহীন কোনো মানুষ আপনি খুঁজে পাবেন না, ঠিক তেমনই লক্ষ্যহীন কোনো মানুষও নেই। আসলে লক্ষ্য ছাড়া মানুষ থাকতেই পারে না, প্রকৃতি তাকে কোনো না কোনোভাবে লক্ষ্য দিয়ে দেয়। আর সবাইকে সেটা অনুসরণ করতেই হয়। আমি আমার নামের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য পেয়েছি।

এই দুনিয়াতে আমরা কিছুই নিয়ে আসি না, বিদায়ও নিই খালি হাতে কিন্তু নাম হলো এমন একটা জিনিস, যা একান্তই ব্যক্তিগত। সবার নামের না-কি অর্থ থাকে। কাজ করে নাম করা যায়। কিন্তু আমার গল্পটা ভিন্ন, আমি নাম অনুযায়ী কাজ করছি। এখন লেখালেখি আমার ভীষণ পছন্দ। মানুষ সময় পেলে নিজের পছন্দের কাজ করে আর আম নিজের পছন্দের কাজ আগে করে বাকি সব পরে করি।

আমি কোনো বড় লেখক হতে পারিনি কিন্তু আমার আফসোস নেই, আমি আমার লক্ষ্য তো পেয়েছি। কিন্তু এই যে লক্ষ্য পেলাম, তার পেছনে ম্যামের অবদান কি ভোলা যায়? তাই ম্যাম আমার জীবনের এক অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছেন। একজন শিক্ষকের যেমন সবাই প্রিয় ছাত্র/ছাত্রী হয় না, তেমনই শিক্ষার্থীর সব শিক্ষক প্রিয় হতে পারে না। সবার আলাদা আলাদা জায়গা থাকে।

ম্যাম শুধু আমার প্রিয় নন বরং আমার জীবনের অন্যতম সেরা শিক্ষিকা। যিনি আমাকে শুধু শিক্ষা নন, জীবনের লক্ষ্য দিয়েছেন।

লোক প্রশাসন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

• প্রবন্ধ

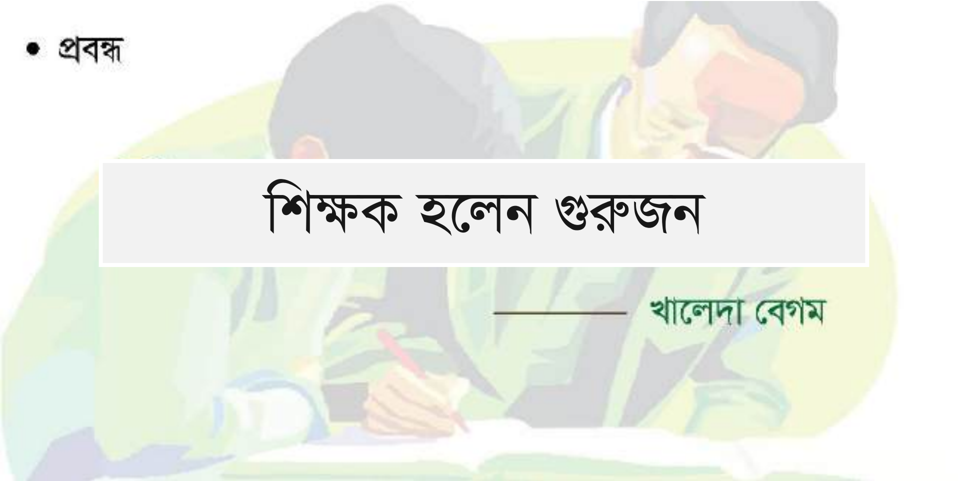

শিক্ষক হলেন গুরুজন

—— খালেদা বেগম

‘শিক্ষক’ শব্দটি অনেক গুরুত্ব বহন করে। শিক্ষক হলেন সেই আলো, যিনি শিক্ষার্থীদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনেন। শিক্ষক শব্দের পূর্ণরূপ হলো, ‘শি’-তে শিষ্টাচার, ‘ক্ষ’-তে ক্ষমাশীল, ‘ক’-তে কর্তব্যপরায়ণ। একজন কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক পারেন শিক্ষার্থীর ভেতরের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে। শিক্ষকের কাজ শুধু পাঠদান করা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে তোলা।

সময়-জ্ঞান, সততা, দায়িত্ববোধ, একজন শিক্ষকের মূলধন। শিক্ষকের আর্থিক অসচ্ছলতা হলেও তাঁর সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, সম্মানজনক, তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

শিক্ষকের উৎসাহ ও প্রেরণায় একজন শিক্ষার্থী অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। একজন শিক্ষক তার জ্ঞান, দক্ষতা, মেধা ও শ্রম দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা জোগান এবং তাদের ভবিষ্যৎ গঠনে সাহায্য করেন।

একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঠিক পরামর্শ দানের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস তৈরি করেন এবং ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করেন। শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর, কারণ তারা তাদের শিক্ষা, আচার-আচরণ, শ্রম ও মেধা দিয়ে আদর্শ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে তৈরি করেন। একজন আদর্শ শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে মডেল। শিক্ষকের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় একজন শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণ

করে। শিক্ষার্থীর মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করা, শিক্ষার্থীদের নীতিনৈতিকতা বোধ শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের অন্যতম কাজ। চরিত্র মানবজীবনে অমূল্য সম্পদ। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উন্নত চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

একজন আদর্শ শিক্ষক সুন্দর সমাজ গড়ার কারিগর। শিক্ষক সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করে সুন্দর সমাজ তৈরি করতে শেখায়। শিক্ষকের উন্নত চরিত্র ও মমত্ববোধ শিক্ষার্থীর জীবনে প্রভাব ফেলে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভেতর সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীল কর্মে আগ্রহী করে তোলে।

শিক্ষক শব্দটি অত্যন্ত মহান, কারণ এর মধ্যে লুকিয়ে আছে, ন্যায়, নিষ্ঠা, আদর্শ ও আত্মত্যাগ। একজন আদর্শ শিক্ষক তার শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বদলে দিতে পারে। শিক্ষকের ধৈর্য ও সহনশীলতা শিক্ষার্থীদের ভুল থেকে শেখাতে সাহায্য করে এবং তারা শিক্ষকদের সম্মান করতে শেখে। শিক্ষক শুধু জ্ঞান বিতরণ করেন না, তিনি এমন একটি ইতিবাচক ও আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি করেন, শিক্ষার্থীরা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার অনুপ্রেরণা পায়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ফলে তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে তাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সম্পর্ক মজবুত করে।

একজন শিক্ষক ভালো শিক্ষা দানের পাশাপাশি তাদের জীবনের লক্ষ্য অর্জনেও সাহায্য করে, তাদের আদর্শ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে তৈরি করে একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে ভূমিকা রাখে। সম্মানিত শিক্ষকদের আদর্শ অনুকরণ করে আজ আমি নিজেও শিক্ষকতার মহান পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেছি। আমি ঋণী আমার সকল শিক্ষকের কাছে। তাদের উন্নত চরিত্র আমাকে প্রভাবিত করেছিল বলেই আজ আমি নিজেই শিক্ষক।

একজন সৎ, দক্ষ ও দূরদর্শী শিক্ষক একটি প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের হাত ধরেই মানব সভ্যতা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

একজন শিক্ষক সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সম্মানের পাত্র। সমাজে ন্যায় বিচার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আদর্শ জাতি গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা প্রদীপের ন্যায় নিজেকে জ্বালিয়ে সমাজকে আলোকিত করেন। শিক্ষকের গুণাবলি বলে শেষ করা যায় না। শিক্ষার্থীদের চলার পথকে সুদৃঢ় করতে শিক্ষকের স্নেহ, মায়া মমতা ও ভালোবাসা অপরিহার্য। শিক্ষকের অবদানকে সম্মান করা এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সকলের নৈতিক কর্তব্য।

‘শিক্ষক হলেন গুরুজন করেন শিক্ষা দান,

জীবন দিয়ে হলেও মোরা রাখব তাদের মান।’

সহকারী শিক্ষিকা, রেইনবো মডেল কেজি এন্ড হাইস্কুল, বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম

যে আলো নেভে না

আব্দুস সাত্তার সুমন

ভোরের আলো তখন মাত্র জানালার পর্দা ছুঁয়ে গেছে। গ্রামের পুরোনো পাঠশালা এখনও নিস্তব্ধ। মাঠে শিশিরভেজা ঘাসে সূর্যের সোনালি আভা পড়ে ঝিলমিল করছে।

এই নিস্তব্ধতার মাঝেও দাঁড়িয়ে আছেন মোস্তাফিজ স্যার। ধবধবে পাঞ্জাবি, চোখে চশমা, মুখে শান্ত হাসি। তিনি জানেন, জ্ঞান শুধু বইয়ের পাতায় থাকে না, তা বেঁচে থাকে মানুষের চরিত্রে, মানুষের বিবেকে, মানুষের ভালোবাসায়।

শ্রদ্ধা ও মমতার পাঠ:

একদিন ক্লাসে এক ছাত্র সুমন। সবসময় চঞ্চল, মনোযোগহীন, মাঝে মাঝে মজা করার ছলে স্যারের কথা এড়িয়ে যায়। একদিন ভুলবশত সে বোর্ডে জল ছিটিয়ে

দিল। সবাই ভাবল, এবার বড় শাস্তি হবে।

কিন্তু মোস্তাফিজ স্যার কিছু না বলে নিজেই বোর্ড মুছে দিলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন: যে নিজের ভুল নিজে ঠিক করতে শেখে না, সে কখনো সত্যিকারের জ্ঞানী হতে পারে না। আজ আমি করলাম, কাল তুমি করবে।

সেই দিন থেকে সুমন বদলে গেল। সে বুঝল, শ্রদ্ধা ভয়ে নয়, ভালোবাসা থেকে জন্ম নিতে পারে। মমতা ও ধৈর্যের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে শিক্ষার প্রকৃত আলো।

শিক্ষকের করণীয় ও বর্জনীয়:

মোস্তাফিজ স্যার কখনো কাউকে অপমান করে শিক্ষা দিতেন না। তিনি বলতেন, একজন শিক্ষক যদি ভয় দেখিয়ে শেখান, ছাত্র হয়তো মুখস্থ করবে, কিন্তু বুঝবে না। তিনি কখনো তুলনা করতেন না, কারণ তুলনা মনকে হীন করে, আর প্রশংসা মনকে জাগিয়ে তোলে। তিনি নিজের জীবনে যা করতেন, ছাত্রদের তা-ই শেখাতেন। সততা, সময়ানুবর্তিতা, ধৈর্য এবং প্রতিটি কাজে দায়িত্ববোধ। তিনি জানতেন, শিক্ষকের চরিত্রই ছাত্রের প্রথম পাঠ্যবই।

একজন আদর্শ ছাত্রের জন্ম:

বছর কেটে গেল। সুমন এখন শহরে এটিএম ইঞ্জিনিয়ার। একদিন সে পুরোনো পাঠশালায় ফিরে আসে। মোস্তাফিজ স্যার তখন বৃদ্ধ, চোখে কম দেখেন, কিন্তু প্রতিদিন পাঠশালায় যান, যেন দায়িত্ব নামের সূর্য এখনও অস্ত যেতে চায় না। সুমন এসে স্যারকে বুকের সাথে জড়িয়ে বলে, স্যার, আপনি না থাকলে আমি শুধু ইঞ্জিনিয়ার নয়, মানুষই হতে পারতাম না।

স্যারের চোখ ভিজে যায়। তিনি বলেন, তুমি মানুষ হয়েছ এটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

মানিকদি, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাংলাদেশ

শিক্ষক স্মৃতিচারণ

আহলিয়া রহমান

শিক্ষক সমাজের সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রতীক। তিনি কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান প্রদান করেন না; একজন শিক্ষকের শিক্ষাদান মানব চরিত্র গড়ে তোলে, জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে। একজন শিক্ষকের সঠিক দিকনির্দেশনা শিক্ষার্থীর জীবন আলোকিত করতে পারে, আবার অবহেলা বা শৈথিল্য তাকে অন্ধকারে ফেলে দিতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী। তাঁদের আলোকিত জীবন প্রমাণ করে, শিক্ষক জাতির স্থির ভিত্তি।

আমার নিজের শিক্ষাজীবনের এক অধ্যায় আজও মনে ভেসে ওঠে। কওমি মাদরাসার একটি স্তর হলো নাহবেমীর জামাত, যা সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে কঠিন। এখানে একাধিক কিতাব পড়ানো হতো, প্রতিটি কিতাবের জন্য আলাদা শিক্ষিকা ছিলেন। কিন্তু একটি কিতাব ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য নির্ধারিত শিক্ষিকা ছিলেন অত্যন্ত কড়া।

তাঁর ক্লাস মানেই ছিল শৃঙ্খলা, কঠোরতা এবং ভয়। তখন মনে হতো, তিনি আমাদের কঠিন করে তুলছেন। ক্লাসে দাঁড়ালেই বুক কেঁপে উঠত। কিন্তু আজ, বহু বছর পরে বুঝতে পারি, তাঁর কঠোরতা ছিল আমাদের মঙ্গলার্থে।

একটি ঘটনা বিশেষভাবে মনে আছে। সে বছর বোর্ড পরীক্ষা নিয়ে সবাই ভয় পেয়েছিল। অনেকেই ভাবছিল, আমাদের ক্লাসের কেউ পাশ করতে পারবে না। কিন্তু তাঁর কঠোর শিক্ষা, ধৈর্য ও তদারকির ফলে আমরা শুধু পাশ করিনি, বরং সারাদেশের মধ্যে মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছি। মেয়েদের ক্ষেত্রে যেখানে পড়াশোনায় মনোযোগ কম দেওয়া হতো, সেই শিক্ষিকা ছিলেন

ব্যতিক্রম। তাঁর আন্তরিকতা ও অন্য শিক্ষিকাদের মেহনতের ফলে আমরা চমৎকার রেজাল্ট করতে পেরেছিলাম।

পরীক্ষার দিনগুলোও বিশেষভাবে মনে থাকে। তিনি পরীক্ষার হলের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেন। আমরা পরীক্ষা শেষ করে বের হতেই ছুটে যেতাম, পরীক্ষা ঠিকমতো হয়েছে কি না জানতে। কয়েকটি দিন তিনি আমাদের কাছে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। যদিও ভুল হলে বকুনি হতো, তবু আজ মনে করলে সেই মুহূর্তগুলো প্রশান্তি দেয়।

আজ আমি নিজেও শিক্ষক। আলহামদুলিল্লাহ, আমার শিক্ষার্থীরাও ভালো রেজাল্ট করছে, এমনকি আমি যে রেজাল্ট করেছিলাম তার থেকেও অনেক এগিয়ে। দেশজুড়ে তাদের নাম উঠে এসেছে মেধা তালিকায়। এই সাফল্যের পেছনে সেই শিক্ষিকার কঠোরতা ও আন্তরিকতার প্রতিফলন স্পষ্ট।

সেই শিক্ষিকার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও দুআ রইল। আল্লাহ তাআলা তাঁর কঠোর মেহনত কবুল করুন, তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর শিক্ষার আলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দীপ্তি ছড়িয়ে দিন।

শিক্ষিকা

আমার প্রিয় শিক্ষিকা

ওমর ফারুক আশরাফী (সভাকবি)

শিক্ষক সমাজের আলোকবর্তিকা। আমার জীবনে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষিকার কাছে পড়ার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু যিনি আমার হৃদয়ে সবচেয়ে প্রিয়, তিনি হলেন ইতিহাস শিক্ষিকা শামীমা নাসরিন আরা ম্যাডাম।

তিনি আমাদের ইতিহাস পড়ান। তাঁর পড়ানোর ধরন অত্যন্ত সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়। কঠিন বিষয়গুলো তিনি বাস্তব উদাহরণ ও গল্পের মাধ্যমে এমনভাবে বুঝিয়ে দেন যে, সবাই সহজে মনে রাখতে পারে। তিনি স্নেহশীলা, ধৈর্যশীলা ও আন্তরিক একজন আদর্শ শিক্ষিকা।

শামীমা নাসরিন আরা ম্যাডাম শুধু পড়াশোনায় নয়, আমাদের চরিত্র গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি সবসময় সত্যবাদী হতে, বড়দের সম্মান করতে ও নিয়মিত পড়াশোনা করতে উৎসাহ দেন। আমি যখন পড়ায় সমস্যায় পড়েছিলাম, তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন এবং আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন। তাঁর জন্যই ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি আমার জীবনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

নাসিরনগর, বি-বাড়িয়া।

● স্মৃতিচারণ

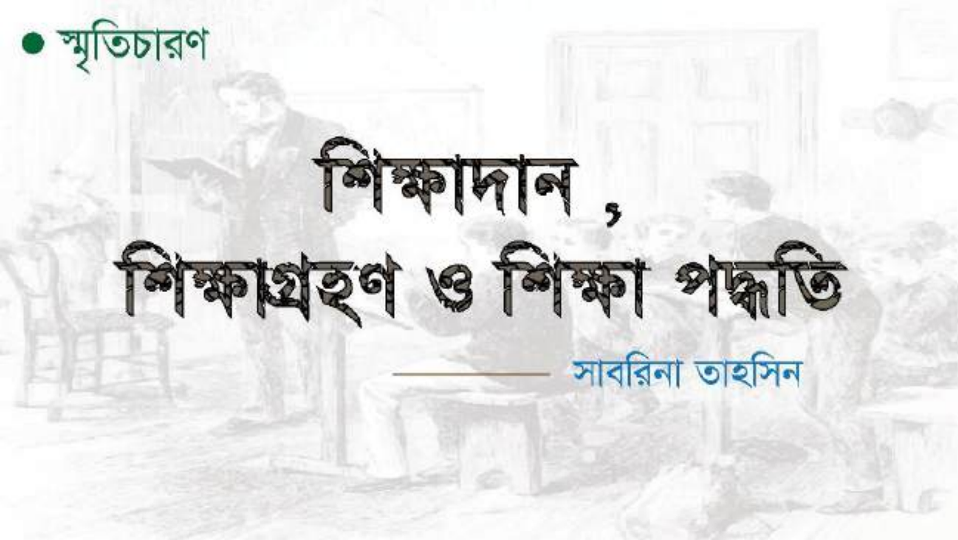

শিক্ষাদান , শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা পদ্ধতি

সাবরিনা তাহসিন

শিক্ষা, জ্ঞানার্জন হচ্ছে প্রতিটি জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি। বিদ্যালাভের মাধ্যমে মানুষের পরিচয় ঘটে বিশ্বজগতের জানা-অজানা নানা তথ্যের সাথে। শিক্ষার সাথে তিনটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

শিক্ষাদান , শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষাদানের প্রধান কান্ডারি অধ্যাপক, শিক্ষক। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে শিক্ষাপদ্ধতি। শিক্ষকগণ মানসম্মত ও রুচিসম্মত শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকগণদের দেখানো পথে রুচিসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করে। মানুষের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে ছাত্রজীবন। আর ছাত্রজীবনে পথপ্রদর্শক হিসেবে অভিভাবকদের পরেই শিক্ষকদের অবস্থান।

আমার ছাত্রজীবনের স্কুল পর্যায়ে আদর্শ গুণসম্পন্ন শিক্ষকগণের সান্নিধ্য খুব একটা হয়নি। তবে কলেজজীবনের স্নাতক পর্যায়ে একজন শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পাই। সে শিক্ষকের নাম মো. আলী ইদ্রিস।

একজন শিক্ষকের মধ্যে যেসব সৎ, আদর্শ ও রুচিসম্মত গুণাবলিসম্পন্ন চরিত্র থাকা অত্যাবশ্যকীয়, ইদ্রিস স্যারের মধ্যেও সেই সকল সৎ ,আদর্শ ও

রুচিসম্মত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। মজার বিষয় হলো, অনার্স ২য় বর্ষ অধ্যয়নকালে তিনি আমাদের কলেজে বহিঃপরীক্ষক হিসেবে এসেছিলেন। আর এর পরের বছরই ইদ্রিস স্যার আমাদের কলেজে বিভাগীয় প্রধান (বাংলা) হিসেবে যোগদান করেন। সপ্তাহের তিন দিন তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন। তিনি কলেজে যোগদানের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাংলা বিভাগ তো বটেই আর সব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একধরনের আত্মিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে ইদ্রিস স্যারের সাথে।

তাঁর সাথে শিক্ষার্থীদেরও সুন্দর মেলবন্ধন গড়ে ওঠে। কোনো শিক্ষার্থী যখন কোনো সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন পরামর্শের জন্য ইদ্রিস স্যারের কাছে ছুটে যায়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাকে অনেক স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে দেখতেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো তিনি আমাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন। ইদ্রিস স্যারের মধ্যে আরও সৃজনধর্মী গুণ আছে, যা অন্যদের মতো আমাকেও বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। যেমন কোনো উৎসব, অনুষ্ঠান, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী সংক্রান্ত কোনো অনুষ্ঠান করতে হলে তিনি নিজের উদ্যোগে স্বল্প সময়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফেলতেন। স্যারের উপস্থিতিতে আমাদের কলেজ বিশেষ করে আমাদের বিভাগ সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। স্যারের উদ্যোগেই বাংলা বিভাগে দুইবার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়েছে।

আমাদের কলেজে পহেলা ফাগুন, পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি প্রভৃতি জাতীয় দিবস বরাবরই উদ্‌যাপিত ও পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী সেভাবে উদ্‌যাপনের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ইদ্রিস স্যারের প্রচেষ্টার কারণেই রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন করা গেছে। তা ছাড়া ইদ্রিস স্যারের সফল ব্যবস্থাপনায় বিভাগীয় অন্য শিক্ষকমণ্ডলীর সহায়তায়, শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বাংলা বিভাগ থেকে হুমায়ূন স্মৃতিতীর্থ নুহাশপল্লীতে শিক্ষা সফরে যাওয়ার সুযোগ হয়।

সেখানে বৃষ্টিবিলাস, লীলাবতী দিঘীসহ চতুর্দিকে সবুজবেষ্টনী উদ্যান নয়নাভিরাম দৃশ্যপট দর্শনে মন প্রফুল্ল হয় এবং নয়ন জুড়িয়ে যায়। তারটর হুমায়ূন আহমেদের সমাধিস্থল দর্শন এবং কবর জিয়ারত করা হয়। তারপর

মধ্যাহ্নভোজ এবং মনোজ্ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে হাসি-গান-আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে কলেজে প্রত্যাবর্তন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে গমন করে। স্মৃতিবিজড়িত সেই দিনটা অনেক আনন্দময় এবং উপভোগ্য ছিল।

ইদ্রিস স্যারের সংস্পর্শে বাংলা বিভাগসহ সম্পূর্ণ কলেজ যেন নবরূপ লাভ করে, নতুন স্পন্দন খুঁজে পায়। কলেজ ম্যাগাজিন বরাবরই করা হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র বিভাগের কোনও ম্যাগাজিন করা হয়নি। ইদ্রিস স্যার স্বতন্ত্র বিভাগের জন্য, (বিশেষ করে বাংলা বিভাগের, যাতে অন্য বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী ম্যাগাজিন করার জন্য স্ব-বিভাগের শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারেন) ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদেরকে ম্যাগাজিন প্রস্তুতের বিষয়ে অত্যধিক মূল্যায়ন করা হয়। ম্যাগাজিন প্রস্তুতের জন্য যাবতীয় তথ্য, বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের উপর দায়িত্বভার দেওয়া হয়। প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী যাবতীয় তথ্য প্রদান ও বিষয়বস্তু সংযোজনসহ যাবতীয় তথ্যাদি দায়িত্বরত চারজন শিক্ষার্থীদের কাছে জমা দেয়। পরবর্তী সময়ে ইদ্রিস স্যারের তত্ত্বাবধানে যাবতীয় তথ্য সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাগাজিন প্রস্তুত করা হয়। মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্যাবতীর নামানুসারে ম্যাগাজিনের নামকরণ করা হয় চন্দ্রাবতী।

কিন্তু এই আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে একটা বেদনাবার্তা বয়ে আসে। ইদ্রিস স্যারের অন্যত্র কলেজের বদলির নির্দেশনা আসে। স্যারের বিদায়ি অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে ম্যাগাজিন চন্দ্রাবতী'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ইদ্রিস স্যারসহ অন্য শিক্ষকদের বক্তৃতা প্রদান, মতবিনিময় করতেই ফটোসেশনের মধ্য দিয়ে বিদায়ি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

কলেজজুড়ে শোকাবহ পরিবেশ তৈরি হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলেই বেদনার্ত হয়ে পড়ে। শোকার্ত-বেদনায় চারপাশের বাতাস যেন ভারী হয়ে ওঠে। ইদ্রিস স্যার আমাদের কলেজে (৮ মাস) স্বল্পকাল অবস্থান করলেও কলেজের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সার্বিক ভূমিকা পালন করেন। বিদায়বেলায় তিনি আমাদের উদ্দেশে একটি কথা বলে

গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমরা যেন বিদ্যা-বুদ্ধির চারা রোপণ করে যাই , যে চারা গাছ পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধির শাখা প্রসারিত করে বৃক্ষে পরিণত হবে। বর্তমানে তিনি মুক্তাগাছা শহীদ স্মৃতি কলেজে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন। তিনি আমাদের কলেজে নেই, কিন্তু তিনি যে বিদ্যা, বুদ্ধির শেকড় সঞ্চালন করে গেছেন, সেই ধারা আমাদের কলেজে এখনও প্রবাহমান। ইদ্রিস স্যারের অনেক স্মৃতিবিজড়িত কথা মনে উঁকি দেয়, প্রযুক্তির কল্যাণে স্যারের সাথে যোগাযোগও হয় মাঝেমধ্যে। স্যার যেখানেই থাকুক, উনি ভালো থাকুক এই কামনা করি।

আকুয়া জুবিলী কোয়ার্টার, ময়মনসিংহ।

তিনি ছিলেন আমার চোখে ধ্রুবতাঁরা

উসামা আহমাদ

জীবনে এমন কিছু মানুষের সান্নিধ্য আসে, যাদের উপস্থিতি জীবনের বাঁকে বাঁকে সুদূরপ্রসারী ছাপ ফেলে দেয়। মাঝিবিহীন নৌকা যেমন নদীতে ঠিক পথে চলতে পারে না, তেমনই একজন নীতিবান ও আদর্শবান শিক্ষক ছাড়া কোনো ছাত্র সফলতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাতে পারে না।

যিনি শিক্ষা ও প্রজ্ঞার আলোকিত প্রদীপ সবার অন্তরে জ্বালিয়ে দেন এবং যিনি পিতার স্নেহ ও মায়ের মমতার পরশ বুলিয়ে দরদি মালীর মতো একটি মানবকলিকে প্রস্ফুটিত করেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক।

এজন্য এত শিক্ষকের ভিড়ে একজনকে বাছাই করা সত্যিই কষ্টসাধ্য। তারপরও কিছু মানুষ হৃদয়ের গভীরে বাস করেন। হয়তো কিছুটা গুণমুগ্ধ, কিছুটা সান্নিধ্য অথবা কিছুটা বাড়তি স্নেহ তাদেরকে স্মৃতিতে অম্লান করে রাখে। আমার শিক্ষাজীবনে তেমনই একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ মাওলানা আ. মুমিন খাঁন হাফিজাহুল্লাহ।

এই মুহূর্তে তাঁকে খুব মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তাঁর চিরচেনা মুখটি। সেদিন থেকেই তাঁকে ভালোবেসেছিলাম, যেদিন তাঁর প্রতি অনুভব হয়েছিল অনুরাগ, প্রীতি ও আকর্ষণ। তাঁকে ভালোবেসেছিলাম হৃদয়ের গভীর থেকে। একান্তই গোপনীয়ভাবে। যাকে এককথায় বলা যায় ‘প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা’।

তিনি ছিলেন আমার চোখের রশ্মিতে একটি আলোকোজ্জ্বল ধ্রুবতারা। তাঁরকার আলো দেখে মানুষ যেভাবে দিক নির্ণয় করে, পথ নির্দিষ্ট করে। তেমনই হুজুরের শালিন ভাষায় আর মর্মকথায় আমরা যেন নতুন কিছু খুঁজে পেতাম। হুজুরের কথাগুলো ছিল খুবই মর্মস্পর্শী। যেন হৃদয় কেড়ে নেয় এমন। তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি হৃদয়ের উদারতা, ভাষার মাধুর্যতা। ই'তিদালের

সবক যেন হুজুর আমাদের হাতে কলমে শিখিয়েছেন। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন সাফল্যের পথরেখা। ছাত্রদের শাসনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন উত্তম অভিভাবক।

জামিয়াতুস সুন্নাহ মাদ্রাসা মাদারীপুর। আমি যখন ভর্তি হলাম, তখন ছিল মেশকাতের বছর। বছরের দরসের প্রথম দিন। হুজুর সিঁড়ি থেকে নেমে আসছেন, আমি কাঁচুমাচু হয়ে সিঁড়ির এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি। আমি সালাম দেওয়ার আগেই তিনি জোরে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম দিলেন।
উত্তর নিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি হেসে দিয়ে বললেন নাম কী? আমি: মুহাঃ উসামা আহমাদ
তিনি বললেন, এ বছর কি নতুন?
আমি: জি হুজুর, নতুন।
তিনি বললেন, আগে কোথায় পড়েছ?
আমি: যশোর দড়াটানা মাদ্রাসায়।
তিনি বললেন, আমি একদিন যশোর গিয়েছিলাম ওলিপুরী হুজুরের বয়ান শুনতে। সেদিন রাতে আমি দড়াটানা মাদরাসায় ছিলাম। এরপর তিনি বললেন, যাও দরসে গিয়ে বসো। পরে সময় করে দেখা করবা। হুজুর এমনিই খুব অমায়িক মানুষ ছিলেন। ছোট বড় সবার সাথে হেসে হেসে কথা বলতেন। যেন মনে কোন প্রকার হিংসা নেই। এটা ছিল হুজুরের উত্তম আদর্শের পরিচয়।

হুজুরের কাছে মেশকাত সানি ও বুখারি শরিফের মাগাজি অধ্যায় পড়েছি। হুজুরের বোখারির মতন পড়া যেন আজও কানে বাজে। তিনি যদি আমার জীবনে না আসতেন হয়তো আমার জীবনটা অন্যরকম হতো। হুজুরের মুখ থেকে কোনো বিষয়ে শুনলেই সেটা যেন আমাদের কাছে নতুন কিছু মনে হতো। তিনি আমাদের প্রেরণার গল্প, আকাবিরদের জীবনী শোনাতেন। তিনি আমাদের অভয় দিতেন, সাহস যোগাতেন। এককথায় তিনি ছিলেন 'আদর্শ মানুষ গড়ার সুতিকাগার'।

হুজুরের মুখ থেকেই শুনেছি সাহসের কথামালা। তিনি একদিন বলেই ফেললেন, আমি (আ. মুমিন খাঁন) খতিব উবাইদুল হক রহ. ও আল্লামা শাহ আহমাদ শফী দা. বা.-এর সামনে খতমে বোখারিতে মতন পড়েছি। আর খতিব সাহেব এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যাকে দেখলেই আল্লামা তাকি উসমানি হাফি. ও রফি উসমানি রহ. চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। আসলেই

হুজুর ছাত্রজীবনে যেমন ছিলেন মেধাবী। অপরদিকে লেখনির দিক থেকে ছিলেন একজন সুচিন্তিত লেখক।

আর উস্তাদ জীবনে হাদিস পাঠদানের ক্ষেত্রে ছিলেন যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। হৃদয়ের সবুজ পাপড়িতে আজও মিশে আছে তার সাফল্যমণ্ডিত স্মৃতি। তিনি আছেন বলেই আমার কাছে পৃথিবী এখনও সবুজ, তাঁর স্নেহ ছায়ায় আছি বলেই আকাশ এত নীল। তাঁর ভাবনায় থাকি বলেই প্রকৃতি এত মনোহর। তাঁর মমতায় ডুবে আছি বলেই সুমুদ্র এত গভীর, তাঁর দুআর ফলেই জীবনের শত অস্থিরতার মধ্যেও আমি এতটা প্রশান্ত, স্নিগ্ধ ও সুধীর।
তাঁর শাসনের চাদরে আবৃত বলেই আমার জীবন ছন্দময়। রব্বে কারিমের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন শায়েখকে রহমতের চাদরে জড়িয়ে নেন, নেক হায়াত দান করেন এবং আমাদের সকলকে উভয় জাহানে সাফল্যমণ্ডিত করেন। আমিন।

সম্পাদক: নয়া জামানা সাহিত্য পত্রিকা

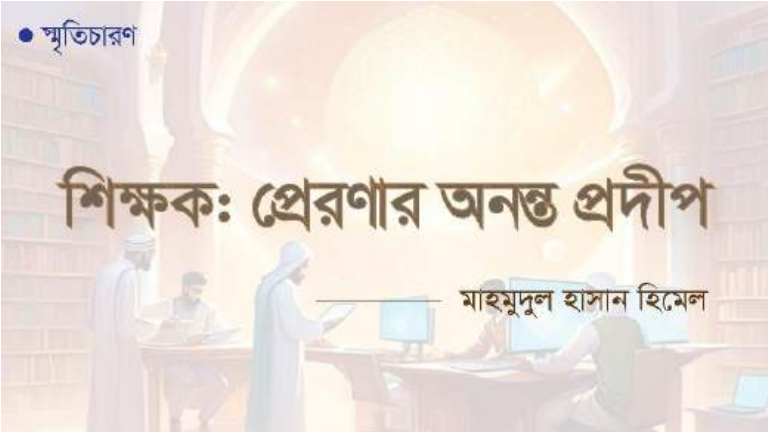

জীবনের প্রতিটি প্রভাতেই কিছু অদৃশ্য হাত আমাদের গড়ে তোলে, নিঃশব্দে পথ দেখায় আলোর দিকে। সেই হাতের নাম–শিক্ষক। তিনি শুধু শ্রেণিকক্ষের বক্তা নন, তিনি আত্মার ভাস্কর, যিনি শব্দের ভেতর ঢেলে দেন জীবনের অর্থ, নীরবতার ভেতর জ্বেলে দেন প্রেরণার আগুন। একজন শিক্ষক আসলে সময়ের এক শিল্পী; তিনি কাঁচা মনের ক্যানভাসে তুলির টানে আঁকেন স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। তাঁর চোখে থাকে ধৈর্য, কথায় থাকে দায়িত্ব, আর নীরবতায় থাকে ভালোবাসার মহিমা। তিনি শিখিয়ে দেন শুধু পাঠ নয়, শেখান–কীভাবে পড়ে গিয়েও উঠতে হয়, কীভাবে হারিয়েও আলো খুঁজে নিতে হয়।

আমরা যখন দিশাহারা, তখন তিনিই বলেন-
'আলো একটু দেরিতে আসে, তবু আসে নিশ্চিতভাবে।'
এই একটি বাক্যই কখনো কখনো পালটে দেয় জীবনের মানচিত্র।

একজন শিক্ষক আসলে সময়ের বিপরীতে দাঁড়ানো এক আলোকবর্তিকা- যিনি ক্লান্ত হন না, ক্ষান্ত হন না।

যেখানে সমাজ অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখানে তিনি জ্বালিয়ে রাখেন মানবতার প্রদীপ। তাঁর প্রতিটি শিক্ষা, প্রতিটি উপদেশ যেন একেকটি নদী–যা বইতে থাকে আমাদের জীবনের ভেতর, অবিরাম, অনন্ত।

শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না; কারণ তিনি এমনই এক সত্তা, যাঁর ঋণ কখনো শোধ হয় না। তিনি আমাদের চোখে জাগিয়ে তোলেন প্রশ্নের সাহস, আর হৃদয়ে জাগিয়ে তোলেন উত্তরের বিশ্বাস।

আজ যখন আমরা স্মরণ করি সেই মানুষটিকে, মনে পড়ে–তিনি কখনো রাগ করেছেন, কখনো প্রশংসা করেছেন, কিন্তু প্রতিটি রাগের ভেতর ছিল মমতা, প্রতিটি প্রশংসার পেছনে ছিল বিশ্বাস।

চলুন, এই শিক্ষক দিবসে আমরা আবার ফিরে যাই সেই শ্রেণিকক্ষে, সেই চকধুলার গন্ধে, সেই কণ্ঠের উষ্ণতায়–যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের জ্ঞানের প্রথম যাত্রা।

কারণ, শিক্ষক মানে কেবল একজন মানুষ নয়, তিনি এক চলমান আলোকশিখা। যিনি নিঃশেষ হয়ে নিজেকে জ্বালিয়ে, আমাদের শেখান কীভাবে উজ্জ্বল হতে হয়।

• স্মৃতিচারণ

স্মৃতির আঙিনায় প্রিয় শিক্ষক

মুহাম্মাদ আমির হামজা

ভোরের আলো ফোটার আগে ঘুম থেকে উঠে আম্মুর পাশে বসে ফজরের নামাজ পড়া আমার প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল। আম্মুর জায়নামাজে ঠোঁট নেড়ে কুরআনের আয়াত পড়তে পড়তে যেন এক অদ্ভুত শান্তি নেমে আসত মনে। নামাজ শেষে আপুদের ওড়নার আঁচল ধরে ছুটে যেতাম মক্তবের পথে। বোগদাদি কায়দা বুকে নিয়ে দৌড়ানোই ছিল আমার সকালবেলার নিয়ম।

সারাদিন কেটে যেত বন্ধুদের সাথে খেলায়—মার্বেল, লাটিম, ঢাং-ঘুটি, আর বিকেলে পুকুরের ধারে পাখির বাসা খোঁজা। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল আমার দুরন্ত শৈশব। তারপর একদিন ভর্তি হলাম গ্রামের নূরানী মাদরাসায়। শুরু হলো জীবনের নতুন অধ্যায়—একাডেমিক পড়াশোনার পথচলা।

সকাল হলে মাদরাসায় যেতাম, বিকেলে আপুদের সঙ্গে ফিরতাম বাড়ি। রাতে হারিকেনের আলোয় পড়তাম যত্ন করে। মাঝে মাঝে একটু অলসতা এলে আম্মুর কড়া শাসন যেন আমাকে আবার সোজা পথে ফিরিয়ে আনত।

আমার বয়স তখন সাত বা আট। মেজো মামা, হাফেজ মাওলানা সাদেকুর রহমান সাহেব হাফিজাহুল্লাহ, তখন কুমিল্লার এক মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন। আলোচনা হলো, আমাকেও সেখানে ভর্তি করানো হবে। আব্বু তখন

বিদেশে, আর আম্মু–যিনি একমাত্র ছেলেকে বুকে আগলে রেখেছেন–তিনি যেন বুকের ভেতর পাথর চাপা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, ছেলেকে দূরে পাঠাবেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়।

সেদিন থেকে মাদরাসায় যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আম্মুর চোখে অশ্রু থামেনি। আমার দিকে তাকালেই কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতেন। মনে হতো, আমি যাচ্ছি, আর হয়তো ফেরা হবে না। অবশেষে এলো সেই দিন–আমাকে কুমিল্লা যেতে হবে মামার সাথে। প্রিয় আম্মু-আব্বু আর বোনদের ছেড়ে।

বাসে চড়ার আগে মামা আমার হাত শক্ত করে ধরে রাখলেন। জীবনে প্রথমবার বাসে উঠছি বলে ভয় আর কৌতূহল দুই-ই কাজ করছিল। এমন সময় এক চোর হঠাৎ মামার ফোনটা ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাল! তারপরও আমরা রওনা দিলাম গন্তব্যের দিকে।

কুমিল্লায় পৌঁছে এক নতুন জীবনের শুরু হলো আমার। নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ–তবু মামা, মামানি আর মামাতো বোনদের কারণে মনটা খুব বেশি একা লাগেনি। মামাই ছিলেন আমার প্রথম ও প্রিয় শিক্ষক। আমরা ছিলাম প্রায় বিশজন ছাত্র। আমি তাঁর কাছে হাতে-কলমে বুঝেছি, কীভাবে একজন প্রকৃত শিক্ষক ছাত্রকে শেখায়-শুধু বই দিয়ে নয়, আদর্শ ও আচরণ দিয়ে।

মামা ছিলেন কঠোর মেজাজের, কিন্তু সেই কঠোরতার আড়ালে ছিল অফুরন্ত মমতা। একদিন কোনো ভুলের জন্য তাঁর হাতে শাস্তি পেলাম। বাড়ি ফিরে আম্মু গোসল করাতে গিয়ে পিঠে দাগ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'মামা মেরেছে, তাই না?' আমি হাসিমুখে বলেছিলাম, 'না আম্মু, খেলতে গিয়ে পড়ে গেছি।' প্রিয় উস্তাদের নামে কখনো অভিযোগ তুলিনি, কারণ জানতাম তাঁর শাসনেই লুকিয়ে আছে ভালোবাসা।

কুমিল্লায় আমি জায়গির ছিলাম। তাই প্রতিদিন জায়গির বাড়ি থেকে খাবার খেয়ে মাদরাসায় যেতাম। আমার এক বদভ্যাস ছিল–খাবার কখনোই পেট ভরে খেতাম না। মামা বিষয়টা টের পেয়ে মাদরাসায় এসে আবার সবার সঙ্গে আমাকে বসিয়ে খাওয়াতেন। আমি ভয় পেতাম, কিন্তু তাঁর ভালোবাসায় সেই ভয়ও ধীরে ধীরে শ্রদ্ধায় রূপ নিত।

এভাবেই সময় গড়িয়ে গেল। মামার কাছে আমি আমপারা, নাজেরা ও হিফজের পাঠ শেষ করি। প্রায় দশ পারা হিফজ করেছি তাঁর তত্ত্বাবধানে। তাঁর

প্রতিটি শাসন, প্রতিটি পরামর্শ আজও আমার জীবনের দিকনির্দেশনা হয়ে আছে।

শৈশবের সেই দিনগুলো এখন শুধু স্মৃতি। কিন্তু আজও চোখ বন্ধ করলে স্পষ্ট দেখতে পাই মামার ক্লাসরুম, তাঁর কণ্ঠের দৃঢ়তা, আর সেই আলোকিত মুখ, যা আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। তিনি শুধু শিক্ষক নন, তিনি ছিলেন আমার জীবনের প্রথম দিশারি–যিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর পথে চলার।

তাঁর কাছ থেকে আমি শিখেছি শৃঙ্খলা, ধৈর্য আর ত্যাগের মানে। তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন, প্রকৃত জ্ঞান কেবল মুখস্থ করার মধ্যে নয়, বরং চরিত্র গঠনের মধ্যে নিহিত।

আজ যখন পেছনে ফিরে দেখি, মনে হয় আমার সোনালি শৈশবের প্রতিটি দিনই ছিল তাঁর ছায়াতলে বেড়ে ওঠার আশীর্বাদ। তাঁর মমতা, কঠোরতা ও শিক্ষা আমাকে আজকের আমি হতে সাহায্য করেছে।

মামা শুধু আমার শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার আদর্শ, আমার চেতনার বাতিঘর। তাঁর হাত ধরেই আমি শিক্ষা পেয়েছি কুরআনের, পেয়েছি জীবনের দিশা।

আমি যখনই জীবনে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাই, তাঁর শেখানো নীতি মনে পড়ে। তিনি ছিলেন সত্যিকারের আলোকবর্তিকা, আমার ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমার প্রিয় উস্তাদ, প্রিয় মামার হায়াত দীর্ঘ করুন, তাঁর মাকামকে বুলন্দ করুন, তাঁকে সুস্থতা ও শান্তির চাদরে ঢেকে রাখুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

শিক্ষার্থী: জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, ঢাকা

এক কিংবদন্তির মহাপ্রয়াণ,

এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঝরে পড়া !

● **রাসেল হোসেন**

এক গভীর শূন্যতা অনুভব করছি। হাহাকার করছে অন্তরের গহিনে। এক কর্মবীর, এক মহাসাধকের সাধনার পরিসমাপ্তি হলো। যার কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে অজপাড়াগাঁয়ের একটা বিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করে। রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজ উদ্দিনের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপিঠ হয়ে ওঠে অনন্য গৌরবের অধিকারী।

তিনি মানুষ গড়ার কারিগর আবু তাহের (বি.কম) স্যার, যার ধ্যানজ্ঞান ছিল এই বিদ্যালয় আর শিক্ষার্থীরা। এক মহান স্বপ্নদ্রষ্টা তিনি। স্বপ্নের ফেরি করেছেন সুদীর্ঘকাল। তাইতো তিনি তাঁর স্বপ্নের মতো মহান হতে পেরেছেন। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সপ্তগাঁও অঞ্চলকে (মানিকপুর, ইসলামপুর, রুদ্ররামপুর, মনোহরপুর, চাঁদপুর, মুরাইম, শ্যামপুর) শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে যে ক'জন বীরপুরুষ নিরলসভাবে কাজ করেছেন, তার মধ্যে আবু তাহের (বি. কম. বি. এড) স্যার-এর নাম সর্বাগ্রেই থাকবে।

তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতাদের (প্রতিষ্ঠাকাল-১৯৭৩) একজন। একজন প্রধান শিক্ষক হয়ে চালহীন, বেড়াহীন, চেয়ার, টেবিল বিহীন একটা স্কুলকে তিনি আপন মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে গড়েছেন, জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় ব্যয় করেছেন নিরলসভাবে–এই বিদ্যালয়ের জন্য। তিনি এক জাদুকর, এক নিপুণ কারিগর ছিলেন কত না শিক্ষার্থীর স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ার।

তার সময়কালে সপ্তগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ছিল সত্যি এক আদর্শ স্কুলের নাম। এ কথা জ্ঞাতজন মাত্রই নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন। আমার এই স্কুলে, তাঁর উষ্ণ সংস্পর্শে থেকে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। হলফ করে বলতে পারি, তাঁর মতো ডেডিকেটেড টিচার একজীবনে

আর পাইনি। দেখিনি ডেডিকেশানের দিক দিয়ে তাঁর কাছাকাছি কাউকে।

তাঁর সহকারী সকল শিক্ষকের প্রতিও আজ সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি, যাদের সম্মিলিত প্রয়াসে তিনি সাফল্যের চূড়া ছুঁয়েছেন।

স্যারকে অনেকটা সময়ে আমরা কাছ থেকে দেখেছি। স্যারের ছোট ছেলে আফতাব উদ্দিন আশেক আমার সহপাঠী প্রিয়বন্ধু, যার সুবাদে তাঁদের বাসায় যাতায়াত ছিল অবাধ। ফলে শিক্ষার্থী পরিচয় ব্যতীত নানান ব্যক্তিগত অম্লমধুর স্মৃতি উঁকি দিচ্ছে মানসপটে। প্রতিটি কঠোর-কোমল চিরযৌবনা স্মৃতি দু'চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু হয়ে ঝরছে।

বর্তমান প্রজন্ম হয়তো জানবে না তাঁর কী অসীম নিবেদন ছিল এই জনপদে। জানবে না স্যারের অকৃত্রিম অবদানের পেছনে কী মেহনত ছিল। বুঝবে না তিনি শুধু একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে নয়, সমাজ-সংস্কারক হিসেবেও কতটা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একটা জীবনকে, এক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই শুধু নন; বরং তাঁর পরিবার-পরিজনদের ত্যাগ-তিতিক্ষা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার মতো কৃতজ্ঞতাবোধ সুবিধাভোগী সবার মাঝে থাকা উচিত। নোয়াখালী জেলার সীমান্তবর্তী অবহেলিত জনপদে সড়ক, বিদ্যুতের মতো নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে যাওয়ার পেছনেও তাঁর অবদান কতটুকু, এই প্রজন্ম হয়তো সেই খবর রাখে না।

মনে পড়ে, ২০০৬ সালে ফেব্রুয়ারির এক শুক্রবার *দৈনিক প্রথম আলো* পত্রিকার প্রধান শিরোনাম ছিল, 'নিরন্তর শিক্ষার্থী একজন শিক্ষক'।

এই রিপোর্টের জন্য স্যার বাহবা পাওয়ার পরিবর্তে তোপের মুখে পড়েন (বিদ্যালয়ের জমিদাতাদের বিষয়টা কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় রিপোর্টে উঠে না আসায়)। তাঁর অবসরটাও হয়নি যথার্থভাবে, তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র হিসেবে এই আফসোস থেকে যাবে সারাটা জীবন। ঘটে যাওয়া এমন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাই তাঁর কর্মযজ্ঞকে সামান্যতম ম্লান করতে যথেষ্ট নয়। আমাদের চরম ব্যর্থতা তাঁর নির্মোহ যাপিত জীবনে হয়তো কোনো প্রভাব ফেলেনি কিন্তু আমাদের (অন্তত আমার/আমার মতো অনেকের) ভেতর এক অপরাধবোধের জন্ম দিয়েছে।

আমরা কেন তাঁর মতো করে তাঁকে বিদায়টুকু দিতে পারিনি? আমরা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, সবাই মিলে সেদিনই

কাউকে ভালোবাসব যেদিন তাঁর মৃত্যুদিন!

আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বলে তার বিস্ময়কর প্রচেষ্টা ও বিচিত্র ঘটনাগুলো কারও কারও কাছে রূপকথা মনে হতে পারে। তিনি স্কুলটিকে কতটা ভালোবাসতেন, তা চোখে না দেখলে যে কারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব না। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত–সব সময় তিনি আর এই স্কুল অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিলেন। অষ্টপ্রহর কষ্ট করে গড়া প্রতিষ্ঠানটির বোবা ইট-পাথরগুলো আজ কেমন করছে জানি না। তবে তাঁর ছাত্র হিসেবে বুঝতে পারছি, তাঁর সান্নিধ্যে থাকা সময়টুকু আজও কতটা মূর্তমান! জীবনের পরতে পরতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সাফল্যের ভাঁজে ভাঁজে তার স্পর্শ চিরকাল রবে।

এত মমতা দিয়ে একটা প্রতিষ্ঠানের, হাজারো ছাত্র-ছাত্রীর জীবনের, একটা অন্ধকার অঞ্চলের জন্য আলোর মশাল হয়ে ওঠা একজন মহাত্মা আবু তাহের বিকম স্যারের পক্ষেই সম্ভব।

বিদায়, হে মহৎপ্রাণ! আমাদের রূপকথার নায়ক, আপনার এই মহাকালে যাত্রা মহান আল্লাহর করুণায় পূর্ণ হোক। আমাদের ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছেন। যা দিয়েছেন তার ঋণ শোধ করার সাধ্য আমাদের নেই। আল্লাহ আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন।

স্যারের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান করে নিন।আমিন।

সহকারী শিক্ষক, মানিকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চাটখিল, নোয়াখালী।

স্বামীজি শিক্ষক

শঙ্করী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতিটুকু বেঁচে থাক, এজীবনের ধরাতলে।

সেদিনটার কথা আজও মনে পড়ে। কিছু কিছু স্মৃতি আছে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু সেগুলোকে নতুন করে ধরে রাখতে চাইলেও ধরতে পারা যায় না। সবই স্মৃতি হিসাবে তুলে রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। রবি ঠাকুরের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে, 'তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে।'

আজ এ রকমই একজন ব্যক্তির কথা বলব, যাকে শত চেষ্টা করেও ভোলার নয়। তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেও প্রধান শিক্ষক তারাপদ সরদার মহাশয়। তার স্কুলজীবনের শেষ দিনে চোখের জল যেন বাঁধ মানছিল না। মনের অজান্তেই দুচোখ বেয়ে হু হু করে অশ্রুনদীর জলধারার মতো অনবরত গড়িয়ে পড়ছিল। তার বিদায়বেলায় আমরা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকসহ সকলে সমবেত হয়েছিলাম।

সেই গৈরিক বসনধারি শান্ত, সৌম্য, ধীর-স্থির, নম্রভদ্র মানুষটি আমাদের ছেড়ে আজ চলে যাবেন, যা আমাদের কল্পনার অতীত।

তিনি ছিলেন আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। এমনিতে শান্ত-শিষ্ট, নম্র-ভদ্র হলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাংঘাতিক। সেখানে কারোর সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ করতেন না। সত্তরের দশকে দাঁড়িয়ে তিনি সেই সময় পঞ্চম শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি অবধি মাতৃভাষার

পাশাপাশি ইংরেজি গ্রামার ও স্পোকেন ইংলিশের প্রতি জোর দিয়েছিলেন। বিপ্লবীদের জীবনী নিয়ে দ্রুত পঠন ও শ্রুতিলিখনের মতো বিষয়গুলোকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সে সময়ে না বুঝলেও আজ অনুধাবন করতে পারি, সেগুলো আমাদের কতটা প্রয়োজনে লেগেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিও তার সুতীক্ষ্ণ নজর ছিল। তাই বোধ হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেমোরি টেস্ট বা স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার মতো বিষয় নির্বাচন করেছিলেন। শারীরিক কসরতের জন্য এনসিসির ব্যবস্থা করেছিলেন। তা ছাড়া অল্প বয়স থেকে যাতে স্টুডেন্টদের বিজ্ঞানের প্রতি প্রবণতা বাড়ে, তার জন্য ক্লাস সেভেন থেকেই ল্যাবে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতটাই তিনি দুরদর্শি ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন আগামী দিন বিজ্ঞানের। বর্তমান যুগে তার দুরদর্শিতার পরিচয় অনুধাবন করছি হাড়ে হাড়ে।

বসিরহাটের মাইল সাতেক দূরে অবস্থিত মফস্বলে এই কাটিয়াহাট বিকেএপি ইনস্টিটিউশান আজও স্বগড়িমায় দাঁড়িয়ে। মেধাবী সব স্টুডেন্ট বেরিয়েছে এই বিদ্যালয় থেকে। তার নিজ হাতে সন্তানসম স্কুল ছিল স্বপ্নের মতো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও মার্জিত মনের মানুষ। সদা স্মিত হাস্যমুখে গার্জেন ও কলিগদের সাথে কথা বলতেন। গৈরিক বসন ও তিলকধারি টুকটুকে ফরসা এই আপনভোলা মানুষটি ছিলেন সকলের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক। সেই শতকে বছরে অন্তত দুবার গার্জেন মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার নির্দেশে ক্লাসের প্রত্যেক ঘরে বিপ্লবী ও মহাপুরুষদের ছবি টাঙানোর ব্যবস্থা হয়। যদিও এই ছবিগুলো প্রত্যেক ক্লাসের স্টুডেন্টরা নিজেদের থেকে চাঁদা দিয়ে কিনত। প্রতি ক্লাসে মনিটর নির্বাচিত হতো ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে। সারাবছর ধরে পঠন-

পাঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে দুটি প্রধান আকর্ষণ ছিল গো-অ্যাজ-ইউ-লাইক ও শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল টুর্নামেন্ট। ফুটবলে স্যারদের জিতিয়ে দিলে একদিন ছুটি পাওয়ার লোভে প্রথমদিকে তারা বেশ কয়েক গোলে পিছিয়ে থাকলেও বিরতির পরে ওনাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে জিতিয়ে দেওয়া হতো।

সেই সময়ে অষ্টম টু টুয়েলভ অবধি স্কুল ফুটবল লিগের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। এর জন্য একজন গেম টিচার ছিলেন। শরীর ও মন ভালো রাখার জন্য সপ্তাহে একদিন করে প্রত্যেক শ্রেণিতে পিটি ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী, ২৩ ও ২৬শে জানুয়ারি, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। আমরা সেসব উপভোগ করতাম। অন্যায় করলে শাস্তি পেতেই হবে। সেখানে কোনো আপস নেই। সে যে-ই হোক না কেন। এই ধরনের মনোভাব নিয়ে চলতেন। সকলের জন্য এক নিয়ম।

আজীবন অবিবাহিত এই স্বামীজি শিক্ষক জীবনের অর্ধকাল কাটিয়েছেন তার দাদা-বউদিদের সাথে। অবসরের পর তিনি চলে গেলেন নবদ্বীপের কোনো মঠে। আমৃত্যু তিনি সেখানেই ছিলেন। স্কুলে পঞ্চম-দশম পর্যন্ত তিনি মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি এতটাই ওয়াকিবহাল ছিলেন। ছোটদের সাথে তাদের মতন ব্যবহার করতেন। ১৫ই আগস্টে এনসিসির পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষ সাজানোর প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত কর্মশিক্ষার প্রচলন ছিল। হাতে ধরে বিভিন্ন

প্রকার মাটির কাজ শেখানো হতো। বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী স্টুডেন্টদের পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যালয়ের পাঠাগার ব্যবহারের নির্দেশ ছিল। তার আমলে এই বিদ্যালয় উন্নতির সোপানে উঠেছিল। সাব ডিভিশনে এই বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য নজির গড়ত। ২৩শে জানুয়ারিতে প্রভাত ফেরির স্মৃতি আজও মনের মণিকোঠায় গেঁথে আছে।

যতই বয়স বাড়ছে ততই যেন স্কুলজীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো পেছনের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় আবার যদি সেই সোনালি দিনগুলোয় ফিরে যেতে পারতাম, তো বেশ হতো। মনে হয় 'স্মৃতি তুমি বেদনার'। আবার কখনো গুনগুন করে গাইতে ইচ্ছে করে, 'এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বল তো?

৮/১, পারুই কাঁচা রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৬১

আলো জ্বেলেছিলেন যারা

‘চক-ডাস্টার হাতে নিয়ে
বেতের ছোঁয়া পিঠে রেখে,
জীবনের অন্ধকার পথে
আলো জ্বেলেছিলেন যারা;
মানুষ তো নয় যেন-
দেবতুল্য তারা।’

হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাওয়া সময়টাতে, আধো-আধো স্বরে কথা বলার বয়সটাতে, অ-আ-ক-খ-এর ছন্দে, বেতের বাড়ির শব্দে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করা মানুষগুলোকেই আমরা শিক্ষক বলে জানি।

প্রাইমারি থেকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁদের সাহচর্যে থেকে একজন শিশু, কিশোর কিংবা তরুণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।
ব্যাটারিবিহীন ঘড়ি যেমন দিনে দুইবার সঠিক সময় দেখায়, তেমন হয়তো শিক্ষকের স্পর্শ ছাড়া কেউ মানুষরূপী হলেও মনুষ্যত্ববোধটা তার মধ্যে সঠিকভাবে জাগ্রত হয় না। শিক্ষকগণ প্রতিটি জাতি গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

একজন প্রকৃত ছাত্রের কাছে তার শিক্ষকের অনুপস্থিতি কখনোই অনুভূত হয় না। শিক্ষকের দেখানো পথে তার এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই শিক্ষকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষক শব্দটা যতটা ছোট, বাস্তবিক অর্থে তার

গভীরতা ততটাই বৃহৎ। শিক্ষকগণ একটি জাতি গঠনের স্তম্ভ হিসেবে দেশ ও জাতির জন্য অবদান রাখেন।
শিক্ষকের সাথে কাটানো ফেলে আসা সময়গুলো কখনো অতীত হয় না।

এগুলো আজীবন আটকে থাকে স্কুল-কলেজের বেঞ্চের কোনায়, স্কুল পালানোর গেইটের কিনারায়, শত আঘাত পাওয়া বেতের স্পর্শে, ইউনিফর্মের কাপড়ে। পৃথিবীতে যতই ঋণ শোধ করার কথা আসুক না কেন, শিক্ষকের ঋণ কখনোই শোধ করার মতো না। প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছে করে-

শিক্ষক তুমি-
রইবে চুলের ভাঁজে
সকাল-সন্ধ্যা-সাঁঝে।

লেখক, সৌরভ চৌধুরী
বিবিএ(অনার্স)- ৪র্থ বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, পটিয়া সরকারি কলেজ।

বাবা আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

আমির হামজা

মানুষের জীবনে কিছু সম্পর্ক থাকে, যেগুলোর মর্ম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গভীর থেকে গভীরতর হয়। শিক্ষকতা এমন এক মহান কাজ, যা শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের শিক্ষা দেন এমন অনেকেই আছেন।

তবে আমার জীবনে একজন শিক্ষক আছেন, যিনি শুধু শিক্ষা দেননি, আমাকে মানুষ হিসেবে গড়েও তুলেছেন। তিনি আমার বাবা। আমার বাবা ছিলেন না কোনো প্রতিষ্ঠানের নামকরা শিক্ষক। তাঁর ছিল না কোনো উচ্চডিগ্রি বা সার্টিফিকেট। কিন্তু আমার চোখে তিনি ছিলেন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠদাতা। তাঁর শেখানো ছিল নিঃশব্দ, কিন্তু গভীর। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে সম্মান নিয়ে বাঁচতে হয়, কীভাবে অন্যের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়।

ছোটবেলায় কোনো ভুল করলে তিনি কখনো ধমক দিতেন না। বরং পাশে বসে বলতেন, 'ভুল করছ, শিখে নাও, তবে থেমে যেয়ো না।' এই নরম কথার ভেতরেই ছিল শক্ত এক শিক্ষা। আর তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বাক্য ছিলঃ 'জীবনে যা করবা, তাতে সব সময় নাম্বার ওয়ান হওয়ার চেষ্টা করবা।'

এই কথাটি আমার রক্তে মিশে গেছে। আমি আজও চেষ্টা করি যেখানেই থাকি, যা-ই করি, সেই 'নাম্বার ওয়ান' হওয়ার মানসিকতা নিয়ে এগোতে।

বাবার কাছে আমি শুধু ভাষা, গণিত বা বিজ্ঞান শিখিনি, আমি শিখেছি মূল্যবোধ, শিখেছি দায়িত্ব, শিখেছি মানুষের প্রতি ভালোবাসা।

তিনি শিখিয়েছেন সফলতা মানে কেবল অর্থ বা খ্যাতি নয়, বরং এমন জীবন যাপন করা, যা অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে।

আজ যখন জীবনের প্রতিটি বাঁকে আমি সিদ্ধান্ত নিই, ভেতর থেকে বাবার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তাঁর শেখানো প্রতিটি কথা, প্রতিটি উদাহরণ এখনও আমার দিশারি হয়ে আছে। এইজন্য আমি দৃঢ় বিশ্বাসে বলি—বাবাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

উৎসর্গ, এই লেখা উৎসর্গ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা,

যাঁর প্রতিটি নিঃশব্দ কর্ম, সহিষ্ণুতা আর আদর্শ আমাকে গড়ে তুলেছে। যাঁর একান্ত কথা 'জীবনে যা করবা, তাতে সব সময় নাম্বার ওয়ান হওয়ার চেষ্টা করবা', আজও আমার পথচলার পাথেয় হয়ে আছে। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও অশেষ ভালোবাসায় উৎসর্গিত।

● স্মৃতিচারণ

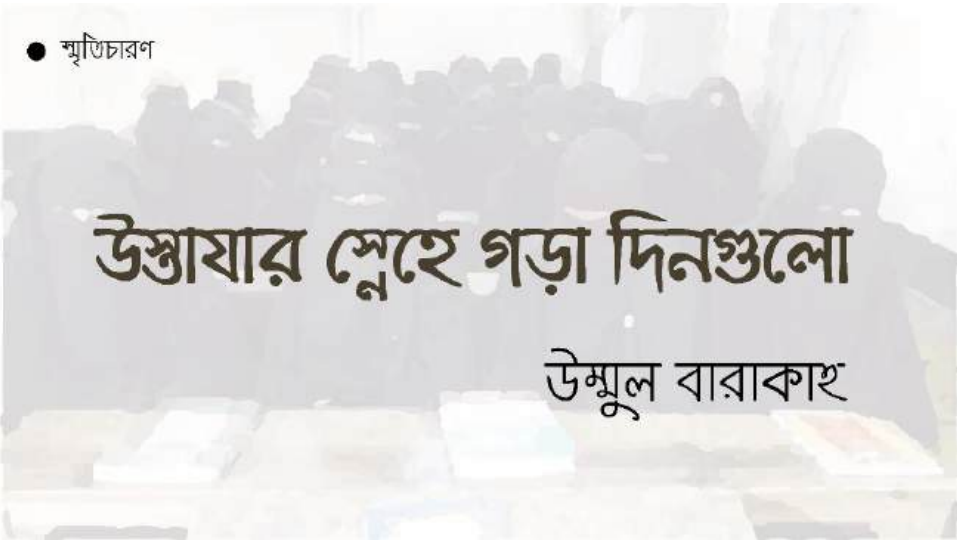

উস্তাযার স্নেহে গড়া দিনগুলো

উম্মুল বারাকাহ

সময় নদীর স্রোতের মতো বহমান। সময়-স্রোতে জীবনতরি এগিয়ে চলে নিজের মতো করে। সে সামনে এগিয়ে চলে। কিন্তু কখনো পেছনে ফিরে যায় না। মাঝে মাঝে জীবনের পেছনে ফিরে তাকাই। তখন মাদরাসা-জীবনের প্রথম দিনগুলো স্মৃতির অ্যালবাম হাতড়ে পাই। মনের মণিকোঠায় ভেসে ওঠে বড় সুন্দর, বড় রঙিন, বড় মধুময় দিনগুলো।

জীবন থেকে খসে যাওয়া কত রঙিন ঘটনা, কত উচ্ছ্বাস! আজও ভুলতে পারিনি। মনে পড়ে মাদরাসা-জীবনের সেই মহান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা। যাদের হাত ধরে, যাদের অনুপ্রেরণায় আজ আমরা এতদূর এসেছি। বাবা-মায়ের পরেই সে মহান শিক্ষকদের স্থান। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দুআ করি তাদের জন্য। সালাম জানাই সেই জাতির নির্মাতাদের।

আমি নির্দিষ্টভাবে কোনো একজন শিক্ষিককে প্রিয় বলতে পারব না। আমাকে পাঠদানকারী প্রত্যেক শিক্ষকই প্রিয়। তবে এমন একজন শিক্ষিকা আছেন, যাকে অন্যদের থেকে একটু বেশি ভালোবাসি। তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা, মুহতারমা মাহমুদা আক্তার। তিনি আমাদের কুরআন ও হাদিস ক্লাস নিতেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতেন, আমরা কেমন আছি। কুশলাদি জিজ্ঞেস শেষে চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ বই দেখতেন। এরপর সর্বপ্রথম আমার থেকে পড়া

নিতেন। আমার পড়া শেষে বাকিদের পড়া নিতেন। ক্লাসে এসেই আমাকে প্রথম বেঞ্চে না থাকলে খুঁজে বের করে বলতেন, 'পড়া দেওয়ার ভয়ে লুকিয়ে আছ না-কি?'

একে একে সবার পড়া নেওয়া শেষে ১০-১৫ মিনিট পাঠ্যপুস্তকের পড়া বুঝিয়ে দিতেন। তাতেই আমাদের পড়া একেবারে মনের মধ্যে গেঁথে যেত। বাকি ৫-৭ মিনিট আমাদের সাথে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা, পশ্চিমা ষড়যন্ত্র, শেষ যামানার ফেতনা, মুসলিম গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। আমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। অন্য শিক্ষকদের চেয়ে তার পড়ানোর কৌশল ছিল ভিন্ন এবং আকর্ষণীয়। তা ছাড়াও তিনি পশ্চিমা ষড়যন্ত্র নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করতেন।

কুরআন-হাদিস থেকে বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় আলোচনা করতেন। মূলত এসব কারণেই তিনি আমার প্রিয় হয়ে ওঠেন। আমি ছোট থাকায় অনেক কিছু বুঝতে পারিনি। তার কাছে জিদ করতাম। তিনি এ নিয়ে কখনো মনঃক্ষুণ্ন হননি বা বিরক্তিবোধ করেননি। মায়ের মতো স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে সব সহ্য করে গেছেন। স্বভাবতই আমি চাপা স্বভাবের মানুষ। কারও সামনে চোখের জল ফেলা লজ্জাজনক মনে করি। কিন্তু বিদায় অনুষ্ঠানের দিন তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলাম। তিনি বারবার সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, এ বিদায় চিরবিদায় নয়। কিন্তু তার চোখেও ছিল অশ্রু।

সকলেই সান্ত্বনা দিয়েছিল। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, আজ থেকে এ প্রতিষ্ঠানে আমাদের অধিকার নেই। আমরা চাইলেও আগের মতো উস্তাজাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারব না। আমার মুহতারমা উস্তাজার সুরেলা কণ্ঠে আর শুনতে পারব না সম্ভাবনাময়ী ডাক।

আমার আজও মনে পড়ে সেসব স্মৃতি। যখন তিনি বলতেন, 'ভালো করে পড়াশোনা করো। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে, সম্ভাবনাময়ী।'

আমি দুষ্টুমি করে তার হিজাব টেনে ধরে বলতাম, 'মরে গেলে সব শেষ। এত পড়ে কী হবে!'

আমার মনে পড়ে সে সময়ের কথা। যখন আমার উস্তাজাগণ বলতেন, তুমি সম্ভাবনাময়ী। তুমি পারবে। জীবনে অনেক বড় হবে...।

আমি জানি না, আমি কতটুকু সফল হয়েছি। তবে আমি এ জীবন চাইনি। সেই মহান শিক্ষিকা আর সহপাঠীদের ছাড়া আমার জীবন নীরস। সেই বিদায় অনুষ্ঠানের পর আমার জীবনের হাসি-আনন্দ উবে গেছে। আমার খুউব ইচ্ছে করে সেই জীবনে ফিরে যেতে। কিন্তু হায়! তা যদি সম্ভব হতো।

নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন শিক্ষিকা, নতুন সহপাঠী আমি চাই না। আমি ফিরে যেতে চাই মুহতারামা মাহমুদা উস্তাজার কাছে।

কিন্তু আমি জানি, জীবনতরি আমাদের সামনেই নিয়ে যায়। পেছনে ফিরে যাওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। তাই পুরোনো স্মৃতির অ্যালবামে আমি সুখ খুঁজি। পুরোনো স্মৃতিতে আমি মহান শিক্ষিকাদের খুঁজে পাই। আল্লাহ তায়ালা সকলকে কল্যাণের সাথে রাখুন। উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম

আমার প্রিয় শিক্ষক

উনাইসা তাহনিয়া

শিক্ষক জীবনের এমনই এক বটবৃক্ষ, যার ছায়ায় নিশ্চিন্তে কেটে যায় যুগ যুগান্তর; এমনই পথপ্রদর্শক, যার নির্দেশে জীবন চলে যায় সরল পথে; এমনই মায়ার কান্ডারি, যার আশ্রয়ে দুঃখ-দুর্দশা হয়ে যায় বিলীন। শ্রেষ্ঠ উস্তাদ যার জীবনে জুটে গেল, সে সফলতার পথ পেয়ে গেল। জীবনে একজন সেরা শিক্ষক পাওয়া তা তো মহাসাফল্যের গল্প।

শিক্ষক তিনি পাঠ্যবইয়ের উস্তাদ, একই সাথে জীবন চলার পথে অভিভাবক, সত্যের দিশারি।

অনেক বছর আগে, তখন বেশ ছোটই ছিলাম, নুরানিতে পড়ি। আমার একজন বিশিষ্ট সহপাঠী ছিল, জ্ঞানে গুনে অসাধারণ একটি মেয়ে। তুখোড় মেধার অধিকারী। তার সাথে আমার সখ্যতাও ছিল বেশ। ওর বাবা ছিলেন আমাদের মাদরাসার উস্তাদ। দুজনের বাসা কাছাকাছি হওয়ার সুবাদে মাঝে মাঝে একসাথে আসা যাওয়া হতো। ওর বাবা থাকত সামনে আমরা থাকতাম পেছনে। তখন থেকে চিনতে পেরেছিলাম সেই মহান ব্যক্তিকে, আমার সে সহপাঠী ছোটবেলাতেই অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেলেও ওর বাবা থেকে গেলেন আমাদের মাদরাসায়।

পর্যায়ক্রমে একসময় শরহে বেকায়া জামাতে যখন পড়ি, সে উস্তাদের সর্বপ্রথম দরস করলাম। নুরুল আনোয়ার কিতাব পড়াতেন আমাদের। কী যে অদ্ভুত ভালোলাগা কাজ করত এই দরসে। সীমাহীন বরকত ছিল

এই উস্তাদের দরসে। বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধাঁচে পড়াতেন। কখনো কিতাব টেনে শেষ করা লাগেনি। দাওরায়ে হাদিসের বছর আরও দুটো কিতাবের দরস দিলেন আমাদের। তিরমিজি আওয়াল, বুখারি আওয়াল। হাদিসের ব্যাখ্যা যখন করতেন, তন্ময় হয়ে শুনতাম। এতখানি ধীরে বলতেন যে, সহজেই নোট করা যেত।

দরসের সময়ের এক মিনিট এদিক-সেদিক করতেন না। কখনো দরসে অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, বেটিরা! কেমন আছ? তখন কণ্ঠে ফুটে উঠত আদর, স্নেহ।

তিনি আমাদের মাদরাসার প্রায় দুই যুগ পুরোনো উস্তাদ। শত শত ছাত্রী তার কাছ থেকে ইলম আহরণ করেছেন, কোনদিন কেউ তাঁর সম্পর্কে সামান্যতম অভিযোগ তোলেনি। চরিত্র ছিল স্বচ্ছ আয়নার মতো পরিষ্কার। তাঁর মতো এমন ভালো মানুষ, এমন ভালো উস্তাদ আর দেখিনি।

তিনি আমাদের হৃদয়ের চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন, তাঁর নির্মল চরিত্র, নিখাদ ব্যক্তিত্বের কারণে।

আয় মালিক, আপনি আমাদের এই মহান শিক্ষককে কেয়ামতের দিন আপনার আরশের ছায়াপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

অশ্রুসজল দুআয় যিনি শামিল

জুয়াইরিয়া সারাহ

সময়টা ছিল কোভিড-১৯ মহামারির পরপর। দীর্ঘ পাঁচ মাসের লকডাউনে গৃহবন্দি থাকার কারণে বেফাক পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা আর অনুষ্ঠিতই হয়নি। পরবর্তী সময়ে আমরা 'অটো পাশ' হয়ে ফজিলত জামাতে ভর্তি হই।

আমার কিছু প্রিয় সহপাঠী হেদায়া জামাতে পড়ার জন্য অন্য মাদরাসায় ভর্তি হলো। তারা চেয়েছিল এক বছর বোর্ড পরীক্ষা থেকে অবসর নিয়ে

দরসের পাশাপাশি আরবি সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করতে; যেন পরবর্তী পরীক্ষায় আরও ভালোভাবে অংশ নিতে পারে। দীর্ঘ নয় বছর একসঙ্গে কাটানো সেই সহপাঠীদের বিচ্ছেদে মনটা কেমন জানি ভারী হয়ে উঠেছিল। সেই ব্যথিত হৃদয় নিয়েই আমি প্রথম দিন দরসে উপস্থিত হই।

প্রথম ক্লাস ছিল মেশকাত সানি, এরপর জালালাইন আওয়াল, একই ওস্তাদের দুই দরস। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, উদ্যমী এবং নিবেদিতপ্রাণ একজন শিক্ষক। প্রত্যেক ছাত্রীর মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে আরবির প্রতি উৎসাহ জাগিয়ে তুলতেন। তখন আমরা মূলত উর্দু শরাহ পড়ায় অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু তিনি নানা উপায়ে আমাদের বাধ্য করলেন মিরকাতুল মাফাতিহ পড়তে। অল্প কিছুদিনেই আমরা সে জটিল কিতাব আয়ত্ত করতে পারলাম।

এর পাশাপাশি তিনি আমাদের ফাতহুল-মুলহিম ও দরসে তিরমিযি পড়াতে শুরু করলেন। তাকমিলের আগেই এগুলোর পাঠ আমাদের কাছে সহজ হয়ে গেল। তাফসিরের জগতে আমরা তখন নবীন; তবুও তিনি আমাদেরকে জালালাইন-এর পাশাপাশি হাশিয়াতুস সাবি, সাফওয়াতুত তাফসির, আত-তারিকু ইলা তাফসিরিল কুরআন এবং তাফসিরে কুরতুবি মুতালাআ করাতেন।

কিতাবের অভাব যেন অজুহাত না হয়, তাই তিনি নিজেই আগে থেকে কপিগুলো সংগ্রহ করে রাখতেন। এসব তিনি পড়াতেন খারেজি সময়ের মধ্যেও, পুরোপুরি স্বেচ্ছাসেবীভাবে। এত উৎসাহ ও নিবেদন যে আমরা পড়তে বাধ্যই হতাম।

এর পাশাপাশি, তিনি আমাদের হাতের লেখা নিয়েও অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। নাশতার বিরতিতে তিনি আমাদের খততে রুকআ অনুশীলন করাতেন। কোনো কিছুর জন্যই তিনি পারিশ্রমিক নিতেন না; সবই ছিল ইখলাসের ফল।

আজ যখন আমরা নিজেরা ছাত্রছাত্রীদের আরবি শরাহ পড়তে উৎসাহ দিই, কিংবা নিজেদের হাতের লেখার প্রশংসা শুনি, তখন সেই স্মৃতিগুলো চোখে ভেসে ওঠে। হৃদয়ের গভীরে জেগে ওঠে কৃতজ্ঞতার তরঙ্গ, আর আঁখি হয়ে ওঠে অশ্রুসিক্ত।

তিনি শুধু আমাদের শিক্ষক নন- ছিলেন একনিষ্ঠ তালিবে ইলম গড়ার কারিগর। তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল এমন প্রজন্ম তৈরি করা, যারা জ্ঞানের আলোয় পৃথিবী আলোকিত করবে।

আজও তিনি আমাদের সকল দুআয় শামিল। থাকবেনও- কারণ তাঁর কর্মগুলো তো এক জীবন্ত সদকায়ে জারিয়া।

আল্লাহ তাহলে তাকে কবুল করুন এবং তার ন্যায় মানুষ গড়ার কারিগর এর উসিলায় আমাদেরকেও কবুল করুন। আমিন।

ঠিকানা: মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রাক্তন শিক্ষার্থী: মাদ্রাসা ফাতেমাতুজ জাহরা (রা:)

আমি এবং একটি ইহসান

মাওলানা আশিকুর রহমান খান

জালালাইন পড়ি। সামনে বাৎসরিক পরীক্ষা। রাতদিন একাকার করে মুতালায় ব্যস্ত। বাহিরে যাওয়া বন্ধ। খাওয়া ও নামাজের সময়টুকু ব্যতীত কিতাবের সাথেই থাকি। পরীক্ষার দুই-তিন আগে বাড়ি থেকে ফোন এলো যে, বাবা প্রচণ্ড অসুস্থ। এ সংবাদ পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। অগত্যা বাৎসরিক পরীক্ষা না দিয়ে বাড়িতে চলে এলাম।

হাসপাতালের বেডে বাবা শুয়ে আছেন। সিটিস্ক্যান করার পর জানতে পারলাম যে, বাবা ব্রেইন স্টোক করেছেন। হতাশায় ভেঙে পড়লাম। কারণ, বাবা ছিলেন পরিবারের উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম। অনেক কিছু ভেবেচিন্তে দোকানের দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হলো। শুরু হলো নতুন জীবন। পড়ালেখার পাঠ চুকিয়ে বাজারের দোকানটা চালিয়ে নিতে হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময় বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিন। রমজান শেষ হয়ে ঈদ চলে এলো। বাবার অসুস্থতা এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। ভর্তি শুরু হওয়ার মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি। দোকানের বিক্রি-বাট্টা ভালো হলেও মনটা পড়ে আছে মাদরাসার আঙিনায়। উস্তাদদের সম্মোহনী দরসের আকর্ষণ হৃদয়কে ব্যাকুল তুলল।

রাতে দোকান বন্ধ করে জায়নামাজে আল্লাহর দরবারে অশ্রুসজল দু'নয়নে ফরিয়াদ

জানাই–মাদরাসায় যেন ভর্তি হতে পারি।

আশ্চর্য হচ্ছে যে, ভর্তির মাত্র একদিন পূর্বে বাবা অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠলেন। রবের দরবারে হাজারো শুকরিয়া জানিয়ে ভর্তির উদ্দেশে ঢাকায় রওনা হলাম।

নতুন বছর। নবীন-প্রবীণ তালিবুল ইলেমদের পদচারণায় মাদরাসার আঙিনা মুখরিত। ভর্তির ফরম ক্রয়ের পর জানতে পারলাম যে, বাৎসরিক পরীক্ষায় যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের নতুন করে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। গেল দুই-তিন মাসের নিদারুণ ঝড়ঝাপটা মস্তিষ্ককে একদম এলোমেলো করে ফেলেছিল। পরীক্ষা দেওয়ার কোনো মানসিক অবস্থাই ছিল না। ভর্তি ফরমে পরীক্ষক হিসেবে যার নাম ছিল, তার কাছে উপস্থিত হই। বাৎসরিক পরীক্ষা না দেওয়া এবং আমার পারিবারিক বিষয়টি জানানোর পর হুজুর নরম দিল হয়ে ভর্তি পরীক্ষার নম্বর সহজেই প্রদান করলেন।

হুজুরের এই ইহসান আমার জন্য নিকষ কালো আধার রাতে উজ্জ্বল প্রদীপের মতোই ছিল। খুব সহজেই ভর্তি হয়ে পুনোরুদ্দোমে পড়াশোনা করতে পেরেছিলাম। আল্লাহ পাক হুজুরকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমিন।

জামিয়া কাশেফুল উলুম হাটখোলা মাদ্রাসা, মধুপুর, টাঙ্গাইল

গুরু ও শুরু

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যখন ক্লাস সেভেনে, তখন আমাদের অঙ্ক স্যার দত্ত বাবু রোজ প্রথমে ক্লাসে আসতেন। এসেই চক নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে কয়েকটি কবিতার লাইন লিখতেন। তারপর নিচে লিখতেন 'কিংশুক'। ওটা ছিল তার ছদ্মনাম, যেটা পরে জানতে পেরেছি। ক্লাস সেভেনে এটাও বুঝতাম না যে, প্রথমে এসেই ব্ল্যাকবোর্ডে যেটা লিখতেন, সেটা কোনো কবিতা। আসলে তখন বাংলা বই-ই এ 'ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবি দাবিয়ে চলে'–এ ধরনের কিছু কবিতার সাথে পরিচয় হলেও কবিতা কী জিনিস কিছুই বুঝতাম না। আর তিনি যা লিখতেন, সেটি খেয়াল করে পড়াতামও না, কারণ জেনে গেছিলাম ওটা নিয়ে স্যার কখনো কোনো প্রশ্ন করবেন না।

কিন্তু লক্ষ করতাম, স্যার কিন্তু এ কাজটি করতে কোনো দিন ভুল করতেন না। এতই তাঁর নিয়মানুবর্তিতা। পরে বড় হয়ে বুঝেছিলাম, বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর কীরকম ভালোবাসা ছিল। নাহলে অঙ্কের টিচার হয়ে বাংলা কবিতা কেউ এরকম লেখে! তবে স্যার তখন উলুবনে মুক্তো ছড়াতেন কি-না কে জানে! কারণ ওই কবিতা ছিল আমাদের বোধগম্যের বাইরে। স্যারকে সাহস করে আমরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করতাম না। স্যার হয়তো বিশ্বাস করতেন আমরা তাঁর ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা কবিতাটি নিশ্চয় পড়েছি এবং তখন না বুঝি পরে একদিন হয়তো বুঝব। কিন্তু এখন

তো আর সেসব লাইনগুলো পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, তবে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা লাইনগুলোর ছবি এখনও চোখে ভাসে। মনে হয় তখন যাকে অবহেলা করেছি, আজ তাকে যদি পেতাম নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারতাম।

যাহোক, বিপদটা হলো যখন স্যার একটি দেওয়াল ম্যাগাজিন বের করলেন তখন। একটা মোটা কাঠের বোর্ড দেখলাম একদিন অফিসের সামনে। সুন্দর হাতের লেখায় কয়েকটি কবিতা নিয়ে ঝুলছে। তখন আরেকটু বড় হয়েছি, ক্লাস এইটে উঠেছি। কবিতাগুলো না বুঝলেও পড়তে পারছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, সেখানে আমার নামেও একটি কবিতা রয়েছে 'সে কোন বালিকা'। কীসব মেঘ ও গাছপালা নিয়ে লেখা। আমি তো অবাক! কারণ আমি সেই কবিতা লিখিনি। স্যারকে জিজ্ঞেস করার সাহস ছিল না, আজকের দিনে হয়তো সম্ভব। আমি ধরে নিলাম যে, সেটা আমারই অক্ষমতা। আমি লিখতে পারিনি বলেই স্যার আমার নামে কবিতা লিখে দিয়েছেন। আমারই আসলে লেখা উচিত ছিল, এটা আমার দুর্বলতা। তারপর থেকে কিছু একটা লিখতে হবে এই চিন্তা ভর করল। অবশেষে গ্রামে প্রায়ই আসত এক মহিলা ফেরিওয়ালা, কাঁধে ইয়া বড় একটা ঝোলা নিয়ে, ঝোলার মধ্যে থাকত মেয়েদের চুড়ি, বালা ইত্যাদি সামগ্রী, তাকে নিয়েই লিখে ফেললাম কয়েকটি লাইন-

ফেরিওয়ালি ফেরিওয়ালি কাদের তুমি ঝি?
ঝোলাখানা দেখাও দেখি ওর ভেতরে কী?

– সেই শুরু।

● গল্প

শিক্ষকের শেষ ক্লাস

রনসুদাস জিতু

পুরো স্কুলটা যেন আজ অন্যরকম আলোয় ভেসে যাচ্ছে। বিকেলের সোনালি রোদ জানালা দিয়ে এসে পড়েছে করিডরে, দেওয়ালে ঝুলে থাকা নানা ছবি আর পুরস্কারের ফ্রেমগুলোর ওপর সেই রোদের কোমল ছায়া নাচছে। মাঠে ছোটদের খেলার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে দূর থেকে, কিন্তু দশম শ্রেণির ক্লাসরুমে আজ এক অন্যরকম পরিবেশ–অপেক্ষা, আবেগ আর অদ্ভুত নীরবতা।

আজ অনিরুদ্ধ স্যারের শেষ ক্লাস। তিরিশ বছরের শিক্ষাজীবনের অবসান হবে এই ঘণ্টার শেষে। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে হাসি নেই, আছে এক অদ্ভুত গম্ভীরতা।

স্যার ধীরে ধীরে ক্লাসে ঢুকলেন। তাঁর পরিপাটি ধুতি-পাঞ্জাবি, মুখে সেই চেনা মৃদু হাসি। কিন্তু চোখের গভীরে যেন হাজার গল্প। তিনি নিজের টেবিলে ব্যাগ রেখে বললেন, 'আজ কোনো পাঠ্যবই খুলতে হবে না। আজ আমরা গল্প বলব–জীবনের গল্প।'

সবাই চুপচাপ তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। স্যার শুরু করলেন নিজের স্কুলজীবনের কথা–

'আমি তোমাদের মতোই একদিন বেঞ্চে বসে থাকতাম। তখন এক শিক্ষক বলেছিলেন, বইয়ের জ্ঞানই সব নয়, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাও শিখতে হবে।

এই কথাটা আমার জীবন বদলে দিয়েছিল।'

তিনি বললেন, কীভাবে ছাত্রদের ভুলে না গিয়ে, তাদের সুখ-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন। কত ছাত্র জীবনের ভয় কাটিয়ে উঠেছে তাঁর পরামর্শে, কতজন আবার হার মানেনি শুধু তাঁর কথায় ভর করে।

'ক্লাসে আমি যতবার পড়িয়েছি, ভেবেছি—তোমাদের বইয়ের বাইরে কোনো শিক্ষা দিতে পারি। সেই শিক্ষা হলো সততা, সহমর্মিতা আর সাহস।'

চুপ হয়ে গেলেন তিনি। বাইরে হাওয়ায় আমগাছের পাতা দুলছে। রোদের আলোতে তাঁর মুখ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে কেউ কথা বলছে না।

হঠাৎ প্রিয়াঙ্কা (শ্রেণির সবচেয়ে দুষ্টু মেয়েটি) দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, আমরা আপনার শেখানো কথা ভুলব না। আপনি যেমন বলেছিলেন, ভালো মানুষ হওয়াই বড় শিক্ষা।'

অনিরুদ্ধ স্যারের চোখ ভিজে উঠল। তিনি ধীরে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে হাঁটলেন, হাতের চক দিয়ে লিখলেন-'শিক্ষা শেষ নয়, শেখা চলতেই থাকে।'

লেখাটি যেন পুরো ক্লাসের অন্তরে গেঁথে গেল। ঘণ্টা বাজার শব্দে সবাই চমকে উঠল। ক্লাস শেষ। কিন্তু কেউ বেরোতে চায় না। স্যার একটি উষ্ণ হাসি দিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। পেছনে সূর্যের আলো পথজুড়ে ঝরে পড়ছে, যেন কোনো প্রদীপের শিখা নিভে যাওয়ার আগে শেষবার ঝলসে উঠছে।

করিডরের মোড়ে দাঁড়িয়ে স্যার একবার ফিরে তাকালেন; ক্লাসের প্রতিটি ছাত্র দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধার নিঃশব্দ অভিবাদন জানাচ্ছে। সেই মুহূর্তে বোঝা যায়, একজন শিক্ষক শুধু স্মৃতিতে নয়, জীবনের অনুপ্রেরণায় চিরকাল বেঁচে থাকেন।

বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

• গল্প

পড়ন্ত বিকেলে

মো. আব্দুল হাই সিদ্দিক

পড়ন্ত বিকেল। পশ্চিমাকাশে নেতিয়ে পড়া সূর্যটা ঘরে ফেরার পাঁয়তারা করছে। এ সময়ে গাঁয়ের পথ ধরে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগে। তাই সাফওয়ানকে নিয়ে হাঁটতে বের হলাম।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল পথের পাশে দণ্ডায়মান এক প্রবীণ ব্যক্তির উপর। যার মুখ ভরা দাড়ি বুক ছুঁয়ে গেছে। শুভ্র দাঁড়িগুলো যেন বাতাসের সাথে খেলা করছে। মাথায় রয়েছে পাগড়ি ও গায়ে জুব্বা। হাতে একটা লাঠি ও চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মনে হয় বয়সটা ষাট থেকে সত্তরের মাঝামাঝি। শেষ বিকেলের হলদে আভায় তার চেহারার দীপ্তিটা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা তাকে দেখে যেন থমকে দাঁড়াই। বিস্মিত দৃষ্টিতে দুজনেই দুজনের দিকে তাকালাম।

ছোটবেলা থেকেই আমরা দুজন একই সাথে গ্রামের ছোট্ট মাদরাসায় পড়াশোনা করেছি। কিন্তু গত কয়েক বছর আগে সাফওয়ানের বাবার চাকরির স্থান পরিবর্তন হওয়ায় সাফওয়ানকে হারিয়ে ফেলি। এখন সে পরিবারের সাথে ঢাকায় থাকে। সেখানেই পড়ালেখা করে।

আমরা দুজন যদিও বা অপারগতার কারণে একত্র হয়ে মনের ভাব আদান প্রদান করতে পারি না। কিন্তু আমাদের

দুজনের মন যেন এক সুতোয় বাঁধা। যেন সর্বদাই সে আমার চিন্তা ও আমি তার চিন্তার মাঝে উপস্থিত থাকি।

এভাবে মাদরাসায় পড়ালেখার মধ্য দিয়ে চলছিল আমাদের দিনগুলো। সুযোগ পেলেই ফোনে কথা হতো আমাদের। এভাবে চলতে চলতে যখন লম্বা এক ছুটি আমাদের সামনে হাজির হয়, তখন পরস্পর একমত হয়ে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। কেননা এ সফরে দ্বীনি কাজ আঞ্জামের পাশাপাশি দুই বন্ধু বেশ দীর্ঘ সময় একসঙ্গে কাটানো সম্ভব হবে। এরই ধারাবাহিকতায় আমি ও সাফওয়ান পরীক্ষা শেষে তাবলিগে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে যাই।

রোজকার মতো শেষ বিকেলে আমরা ঘুরতে বের হই। আজ নতুন এক পথ ধরে হাঁটছিলাম হঠাৎ সেই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম।

পথের পাশের সেই বৃদ্ধটির মায়াভরা চেহারায় অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলাম। কেমন জানি মায়াবী ভাব অনুভব করলাম। মনে হলো যেন তিনি আমাদের কোনো আপন মানুষ। চেহারাটা চেনা চেনা লাগলেও কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না।

সাফওয়ান বলল, বন্ধু! তাকে আমার কেমন জানি চেনা চেনা লাগছে। আমারও তা-ই মনে হয়। একটু চিন্তা করো তো তিনি আমাদের আপন কেউ হতে পারে?

দুজনেই লোকটির দিকে এগোলাম আর স্মৃতির পাতা হাতড়াতে লাগলাম। পরক্ষণেই আমার স্মরণে এলো এটা তো আমাদের শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হজরত মাওলানা রুহুল আমিন হাফিজাহুল্লাহ।

তার কাছেই আমাদেও শৈশবের একাংশ কেটেছে। তিনিই ছিলেন আমাদের শিক্ষাজীবনের মুলভিত্তি; তাঁর হাত ধরেই আমাদের পথচলা ইলমের এই শহরে।

আমি ও সাফওয়ান যখন আমাদের গ্রামের ছোট্ট মাদরাসায় পড়াশোনা করতাম, তখন তিনি সেখানকার মক্তব বিভাগের ওস্তাদ ছিলেন। তিনি তাকওয়া, পরহেজগারি, দ্বীনদারি ও চরিত্রগত দিক থেকে অতুলনীয় ছিলেন।

আমরা মাদরাসা থেকে বিদায় নেওয়ার কয়েক মাস পর তিনিও চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। শুরুর দিকে ফোনে কথা হলেও পরে নম্বর হারানোর কারণে আর কথা হয়নি। যেহেতু সেই সময় আমরা অনেক ছোট ছিলাম, তাই তিনি আমাদেরকে একটু

বেশিই আদর করতেন, এজন্য তাঁর কথা মাঝে মাঝেই আমাদের মনে পড়ত।

যদিও অনেকবার আমরা শুনেছিলাম যে, হুজুরের বাড়ি এই অঞ্চলেই। কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, আমরা যে গ্রামে তাবলিগের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, তার পাশের গ্রামটাই হুজুরের গ্রাম।

বাড়ি থেকে এতদূরে এসে আচমকা একজন পূর্বপরিচিত ওস্তাদের সাথে দেখা হওয়ার অনুভূতিটা যে কেমন, তা বলে বোঝানো সম্ভব না।

হুজুর যখন আমাদের দেখলেন, তখন তিনিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। আর আমাদের মনে হচ্ছিল যেন আমরা আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন জয় করেছি। অতঃপর হুজুর আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আলিঙ্গন করলেন, যেটা ছিল আমাদের জন্য স্বপ্ন স্বরূপ।

আল্লাহ তায়ালা যেন পৃথিবীর প্রত্যেক ওস্তাদকেই নেক হায়াত দান করেন এবং সকল ওস্তাদ ও ছাত্রের সম্পর্ককে চিরঅটুট রাখেন। আমিন।

শিক্ষার্থী, আল-জামিয়াতুল আরাবিয়া শামছুল উলুম নিশিন্দারা (কারবালা মাদরাসা) বগুড়া

● গল্প

আমার উস্তাদ: জীবনপথের আলোকবর্তিকা যারা

জাবের আব্দুল্লাহ

জীবনের কতগুলো বসন্ত পার হয়ে গেছে। কতশত কাকডাকা ভোর ম্লান হয়ে গেছে। সময় বয়ে গেছে তার নিজস্ব গতিতে, ঠিক বহতা নদীর মতো। যেন থামবার কোনো ফুরসত নেই। সময়ের পালা বদলে ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়ে দেখা দেয়, ঘটে যায় অনেক কিছু। বদলে দেয় অনেক কিছু। আবার সময়ের স্রোতে ভেসে যায় সবকিছু। জীবনের স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে হারিয়ে যায়। এক এক করে অতীত হয়ে যায় দিন, মাস, বছর। শুধু কালের নিদর্শন হয়ে থাকে কিছু ঘটনা, আর কিছু স্মৃতি। যা মানুষ অতি সযত্নে ধরে রাখে মনের গভীরে। হৃদয়ের গহিনে, গোপন স্মৃতিপটে।

দীর্ঘ তেরো বছর আমার জীবনের 'শিক্ষা বসন্ত'। এই তেরো বছর গত হয়েছে একাধিক মাদরাসায়। শতাধিক উস্তাদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে। তাদের সকলেই শ্রদ্ধার আর ভালোবাসার। কিন্তু পুষ্প কাননে যেমন অনেক ফুল থাকে, সবগুলোই দেখতে সুন্দর, কিন্তু অনেক ফুলের মাঝেও কোনো কোনোটা হয় একটু ভিন্ন, রঙে বা সুবাসে। তেমনই কোনো কোনো উস্তাদ হোন আচরণে বা উচ্চারণে অন্যদের চেয়ে মহান। অনন্য। আজ যখন স্মৃতিকথা লিখতে বসেছি, জীবনের এলবামে তাদের সোহবতে কাটানো শত-সহস্র স্মৃতিদের ভিড় জমে উঠেছে। তবু আমি তাদের স্বরণে সেসব থেকে যতসামান্যই উল্লেখ করব।

১.

তখন নির্দোষ আনন্দের ছেলেবেলা। সবেমাত্র শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি। স্কুলে পড়ার পাশাপাশি বাসাতেই মক্তব পড়ি। এখনও মনে আছে, যেদিন আব্বু সাথে করে হুজুরকে নিয়ে এসেছিলেন বাসায়, প্রথম দেখাতেই তাকে আমার ভালো লেগে যায়। শ্রদ্ধায় মাথাটা নুয়ে আসে। রাশভারী চেহারা, কালো দাড়ি আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জুব্বায় হুজুরকে বেশ মানায়। তিনি হেসে হেসে আদর করে পড়াতেন আলিফ, বা, তা...। ধৈর্য সহকারে বারবার বলতেন। পড়ানোর সময়ই মুখস্থ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে কপট রাগ দেখাতেন। মনে পড়ে, কখনোই তিনি হাত তোলেননি আমার গায়ে। তখনই কচি মনে অনুভব করেছিলাম একজন শিক্ষক কীভাবে পিতার শাসন আর মায়ের সোহাগ এক করে পড়ান। হুজুরের মায়া, মমতা আজও ভুলতে পারিনি। কখনো ভুলতে পারব না। সেই মক্তব পড়েছি হুজুরের কাছে। তারপর সাক্ষাৎও হয়নি আর, কিন্তু অতীত হাতড়ালে প্রিয় উস্তাদের কথা মনে পড়ে। এখনও চোখের পাতা বন্ধ করলে হুজুরের কান্তিময় চেহারা জলছবির মতো ভেসে ওঠে।

২.

তারপর যখন একটু বড় হই। মাত্র শৈশবের গণ্ডি পেরিয়ে কৈশোরে পা রাখি। তখন পিতা-মাতা আর প্রিয়মুখ, সবকিছু ছেড়ে সুদূর চাঁদপুরে পড়তে যাই, তখন যিনি আমাকে একই সাথে বাবার শাসন আর মমতাময়ী মায়ের ভালোবাসা দিয়ে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখান, তিনি হলেন চাঁদপুরের বিখ্যাত মাদরাসা মুমিনপুরের মুহতামিম সাহেব। খালেদ মুহসিন সাহেব রাহিমাহুল্লাহ। আমার জীবনে যার অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি আদর, সোহাগ করে আনন্দ দিয়ে পড়াতেন। টার্গেট দিয়ে দিয়ে পড়াটা চটজলদি আদায় করে নিতেন। ফলে অবিশ্বাস্যভাবেই মাত্র পাঁচ মাসে তার কাছে কুরআনের নাজেরা শেষ করে ফেলি।

আমি হুজুরের কাছে নাজেরা পড়তাম। অথচ হুজুর একদিন ডেকে বললেন 'চার পারার আঠারো নাম্বার পৃষ্ঠাটা মূখস্থ করে শুনাও।' আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। তখনকার অবুঝ দিনে হাজারো শ্রুতিকথার মধ্যে কীভাবে যেন আমি এটাও জানতাম–কুরআনের এই পৃষ্ঠাটা সবচেয়ে কঠিন। আমাকে আমতা-আমতা করতে দেখে হুজুর সাহস

দিলেন। অভয় বাণী শোনালেন। আমিও আশা ও সাহস পেয়ে পৃষ্ঠাটি মুখস্থ করে শুনিয়ে ফেললাম। সেদিন হুজুর খুশি হয়ে বলেছিলেন 'এই তো তুমি হাফেজ হওয়ার সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে।' তখন বুঝিনি। আজ বুঝি, আমার ছোট্ট মনে সাহস জোগানোর জন্য ওই কথাটার বড্ড প্রয়োজন ছিল।

আবার পড়া না পারলে তিনি কঠিন হয়ে যেতেন। ভীষণ রেগে যেতেন। এক দিনের ঘটনা। শীতের সকাল। মাদরাসা নদীর তীরঘেঁষে হাওয়ায় শীত যেন একটু বেশিই, সেদিন পড়া পারিনি, হুজুর রাগ করে শাস্তি দিলেন। একশতবার কানে ধরে উঠবস করলাম। বয়সে ছোট এবং শহুরে হওয়ায় শাস্তির ধকল সইতে পারলাম না। অসুস্থ হয়ে পড়লাম। খবর পেয়ে হুজুর আমাকে দেখতে আসলেন। পাশে বসে ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করলেন। এক ছাত্রকে দিয়ে ওষুধ আনালেন। আরেকজনকে দিয়ে থেকে নিজের বাসা থেকে বোয়াল মাছের তরকারি আর ফলমূল আনালেন। হুজুরের অভূতপূর্ব এই স্নেহ দেখে আমি পুলকিত হই। শ্রদ্ধায় বুকটা ভরে ওঠে। অসুস্থতার কথা ভুলে যাই। এরপর সুস্থ হওয়ার পর দীর্ঘদিন হুজুরের বাসায় খেয়েছি। যেন আমি তার আত্মীয় বা ঘরের লোক। লজ্জা করে একদিন খেতে না গেলে হুজুর রাগ করতেন।

এমন হাজারো নিঃস্বার্থ স্নেহের ফসল আমি অধম। তার কাছে পড়েছি একযুগ গত হলো। আহা, আজ তিনি পৃথিবীতে নেই। তবু আমার তাকে মনে পড়ে। আজও তিনি হাজারো অনুগ্রহ পুঁজি করে আমার অস্তিত্ব জুড়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছেন।

৩.

এরপর ঢাকায় পড়ব বলে সেখান থেকে চলে আসি। অজপাড়া গাঁয়ে পড়া ছাত্র আমি তখন অনেক কিছুই বুঝি না। ঢাকার পরিবেশটাও মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। বড় মাদরাসা, বড় পরিবেশ আর নতুন জীবন। তাই জীবনতরিটা যেন মাঝিহীন মাঝ নদীতে ভাসমান। তখন সবেমাত্র হিফজখানা থেকে বের হয়েছি। খাঁচায় বন্দি মনটা এই কদিনে যেন মুক্ত বাতাসের স্বাদ পেয়েছে, শুধু ঢাকার রাস্তায় ছুটে চলতে চায়। ঘুরাঘুরি, আড্ডা আর রেস্টুরেন্টে ঘুরেফিরেই দিন কেটে যায়। অথচ বিরাট বিরাট স্বপ্ন দিয়ে জীবনটাকে গড়ব ভেবেছিলাম। কখনো সখনো রাতের আঁধারে একাকী হলে বিবেকের হালখাতা খুলে যেত, নিজেকে মনে হতো আমি

যেন পথহারা পথিক, পথের দিশা যার নেই। আমার চারিদিক ছেয়ে গিয়েছিল নিরাশার নিকষ কালো আঁধারে। তখন যিনি সকল হতাশা আর নিরাশার আঁধার চিড়ে আলোর বিকিরণ ঘটিয়ে আমার জীবনে আত্মপ্রকাশ করলেন, তিনি মানব গড়ার এক শ্রেষ্ঠ কারিগর। মাওলানা কামরুল হাসান সাহেব হুজুর।

একাধারে যিনি ছিলেন পড়ার পর টেবিলে একজন গুরুগম্ভীর আদর্শ শিক্ষক। চরিত্র সংশোধনের বেলায় যিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল পিতা। আদর সোহাগের বেলায় যিনি ছিলেন মমতাময়ী মা। খোশগল্প কিংবা বন্ধুসুলভ আচরণে যিনি ছিলেন উত্তম সঙ্গী। আর শেষ রাতের জায়নামাজে যিনি ছিলেন খোদার রাহে আত্মোৎসর্গকারী একজন মর্দে মুমিন। দিনদিন পাতলা, লম্বা শরীরের গৌরবর্ণ মানুষটা আমার হৃদয়-মন আকৃষ্ট করে নেয়। আমার অজান্তেই স্বপ্ন জয়ের অসীম যাত্রায় তিনি একজন দক্ষ নাবিক হিসেবে ধরা দেন। আজকের এই আমি তার আদর্শেরই প্রতিচ্ছবি যেন! তার ব্যাপারে যতই লিখি, ততই যেন কম হয়। আমার জীবনে তার অবদান অপরিসীম। আমার অস্তিত্বের প্রতিটি কণা তার কাছে ঋণী। আসলেই তার ঋণ অপরিশোধ্য।

মাঝে মাঝে তাদের সান্নিধ্য হারিয়ে খুব আফসোস হয়। শিক্ষাজীবনের বাঁকে বাঁকে যেসব আলোকপ্রদীপ পেয়েছি, হায়, যদি তাদের সান্নিধ্যটা আরেকটু দীর্ঘায়িত হতো! যদি তাদের রঙে আরেকটু রঙিন হতাম! তাহলে জীবনটা আরও উজ্জ্বল, আলোকময় হতে পারত। আহা! তারা ছিলেন আদর্শের বাতিঘর। আমাদের রাহবার।

সবশেষে বলব আল্লাহ যেন তাদের আদর্শকে বুকে লালন করে আমাকে ঘিরে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করেন। আর আমাদের উপর জীবিতদের ছায়া দীর্ঘায়িত করেন।

শিক্ষার্থী, জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদ্রাসা, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

যারা ছড়ায়ে গেয়েছেন গুরুগান

শিক্ষক দিবস স্মরণে

মিহির পাল

শি- শিক্ষক যাঁদের আদর্শ ধর্ম
নিত্য শেখান সৎ কর্ম।
ক্ষ- ক্ষমা মায়া মমতা ভরা
যাঁদের কর্ম সমাজ গড়া।
ক- কর্ম শেখান শরীর দেখে
সুস্থ শরীর অক্ষুণ্ন রেখে।

দি- দিনে রাতে দেন শিক্ষা
শিক্ষা অধিকার, নয় ভিক্ষা।
ব- বদ বাঁদর অলস যারা
শিক্ষা গুণে শোধরায় তারা।
স- সকল শিক্ষকের রাখবো মান
শিক্ষক দিবসে জানাই প্রণাম।

রামপুরহাট

শিক্ষক

আহমেদ আশিক

শিক্ষক হলো জ্ঞানের গুরু
ছড়ায় তারা বিদ্যার আলো,
তাদের হাতে শিক্ষার শুরু
সরান দূরে আঁধার কালো ।

পিতার কিংবা মাতার পরে
শিক্ষক ভবে সবার সেরা ,
জ্বালান আলো জনম ভরে
আলোর পথে চলেন এরা ।

শিক্ষক হলো শ্রদ্ধার পাত্র
তাদের কাছে সবাই ঋণী ,
জগৎ মাঝে শিক্ষক ছাত্র
বিদ্যার চর্চা প্রত্যেক দিনই ।

শিক্ষক বৃন্দ গড়েন জাতি
হৃদয় ভরা আবেগ নিয়ে ,
জ্বালান সূক্ষ্ম জ্ঞানের বাতি
শেখান তারা দরদ দিয়ে ।

ভাবেন সদা ভাবুক কবি
শিক্ষার আলো ছড়ান যিনি,
ভবের মাঝে জ্ঞানের ছবি
ছাত্রের গুরু শিক্ষক তিনি ।

সবার চোখে শিক্ষক প্রিয়
আমার কথা নয়কো মিছা ,
সবাই তাকে সম্মান দিও
শিক্ষক হলো আলোর দিশা ।

টাংগাইল সদর

শিক্ষক দিবস

শাহজালাল সুজন

উনিশ শত পঁচানব্বই
ইউনেস্কো দেয় ঘোষণা,
সারাবিশ্বে পালিত হয়
শিক্ষক দিবস সূচনা।

জাতি গঠন করতে হলে
শিক্ষকের রয় অবদান,
শিক্ষক হলো মহান গুরু
স্মরণ করি তাদের মান।

দেশ ও জাতি উন্নত হয়
শিখর লক্ষ্যে পৌঁছে তাই,
শিক্ষক ছাড়া সবই অচল
মূল ভিত্তিটা যেন নাই।

শিক্ষক দিবস ঘিরে সবাই
প্রতিপাদ্যে করি পণ,
তাদের সম্মান প্রাপ্যাধিকার
দিতে গড়ি শুদ্ধ মন।

ঢাকা, গাজীপুর

প্রিয় শিক্ষক

বি এম মিজানুর রহমান

লেখাপড়া শিখে কেহ
দেশের সেরা গুণী,
ভক্তিভরে সবাই মোরা
তাঁদের কথা শুনি।

গুণী হলেন শিক্ষাগুরু
সমাজ মাঝে সেরা,
জীবন মোদের অনেক বেশি
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

সেরা শিক্ষক কে জীবনে
প্রশ্নের উত্তর জানা!
নাম বলিতে কেউ কাউকে যে
করে না তো মানা।

জানো নাকি তোমরা কেহ
প্রিয় শিক্ষক কে যে?
আমার প্রিয় শিক্ষাগুরু
কেবল আমার মা যে।

মায়ের কাছে প্রথম শেখা
নানান বর্ণের হাসি,
আদর স্নেহ যত্নের শিক্ষক
মাকে ভালোবাসি।

নড়াইল, বাংলাদেশ।

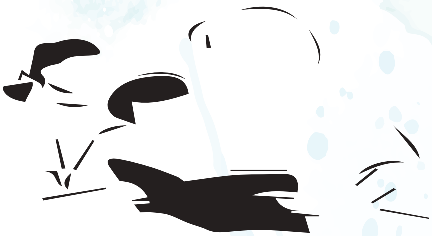

শিক্ষক

সাইদুল ইসলাম সাইদ

এই সমাজের কিছু শিক্ষক
স্বার্থ ছাড়াই চলে,
জ্ঞানটুকু সব বিলিয়ে দেয়
উচিত কথা বলে।

ন্যায়ের পথে অটুট থাকে
শিক্ষিত দেশ গড়তে,
বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের
নামটা তুলে ধরতে।

তবু তারা সম্মান পায় না
এই সমাজের কাছে,
তাদের নিয়ে তিক্ত কথার
হাজারো লোক আছে।

আমার প্রিয় শিক্ষক তারা
সালাম শ্রদ্ধা করি
হিংসা বিবাদ ভুলে সবাই
সোনার বাংলা গড়ি।

শিক্ষার্থী, টংগী সরকারি কলেজ
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

শিক্ষাগুরু

মিজান পঞ্চায়েত

শিক্ষাগুরু জ্ঞানের মশাল
জ্ঞানের আলো ছড়ায়,
সন্তানতুল্য আপন ভেবে
শিক্ষার্থীদের পড়ায়।

ভালো ছাত্র গড়তে শিক্ষক
সদা চেষ্টা করে,
জ্ঞান অর্জন করে যেনো
মানুষ হতে পারে।

শিক্ষকের নির্দেশমতো
চেষ্টা করে যারা,
উচ্চ শিক্ষা লাভ করে
জীবন গড়ে তারা।

জ্ঞানীগুণী মানুষ হয়ে
চালায় সমাজ দেশ,
সারা বিশ্বে উজ্জ্বল করে
নিজ দেশের বেশ।

শিক্ষা দেওয়ার মহান ব্রত
শিক্ষক পালন করে,
তাইতো মানুষ সারা বিশ্বে
তাদের সম্মান করে।

প্রধান শিক্ষক,
করপাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

শিক্ষকদের কষ্টের কথা

বিধান চন্দ্র দেবনাথ

এমপিওভুক্ত শিক্ষকসমাজ
রাস্তায় থাকব কত?
একে একে ষোলোটা দিন
করলাম আমরা গত।

মোদের যত দুঃখের কথা
বলছি জনে জনে,
যখনই যে সরকার আসে
কেউ রাখে না মনে।

দিনের পরে দিন কেটে যায়
উৎসব ভাতা সিঁকি,
উৎসব আসলে সেই শিক্ষকদের
আনন্দ হয় বিকি।

এক হাজারে বাড়ি ভাড়া
কোথায় বলো পাবে?
সাড়ে বারো হাজার দিয়ে
কীভাবে মাস যাবে?

চিকিৎসা বিল পাঁচশ টাকা
কেমন আজব দেশ!
ডাক্তারের ফিস দিতে গেলেই
পাঁচশো টাকা শেষ।

ঔষধ কিনে খাওয়ার জন্য
টাকা কোথায় পাবো,
মন্ত্রী-আমলা বলুন তো স্যার
ক্যামনে ঔষধ খাবো?

যোগ্যতাটা আছে ঠিকই
বি-এ কিংবা এম-এ
অধিকারের কথা বললেই
আপনাদের তো ঘামে।

ন্যায্য দাবি পূরণ করে
ক্লাসে ফেরান দ্রুত,
শিক্ষক যেন জীবনটা পায়
তাদের মনের মতো।

জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

জ্ঞানের রক্ষক

মো. সাব্বির হোসেন টুটুল

জ্ঞানের রক্ষক মহান শিক্ষক
তিনি মোদের আশা,
শিক্ষক মোদের পিতৃতুল্য
চেষ্টা তাহার খাসা।

জ্ঞানের পথে জীবনভরে
তিনি দিলেন শিক্ষা,
তাহার দেওয়া শিক্ষা নিয়ে
নিব সবাই দীক্ষা।

শিক্ষক মোদের সরল পথে
সদা জ্বালেন আলো,
জ্ঞানের আলোয় জীবন দিয়ে
দূর করে দেন কালো।

সারাজীবন শিক্ষকের মান
রাখব আমরা সবে,
তবেই আমরা সফল হবো
সুখে থাকব ভবে।

শিক্ষক মোদের জীবনভূমে
দীপ্ত প্রদীপ আগুন,
তাহার তরেই অন্তর ভরে
ছুটে আসে ফাগুন।

শিক্ষক

তোফায়েল এ আর

সীনায় সীনায় রোজ চলাচল
হরেক রকম জ্ঞান
পাড়ায় পাড়ায় সুর সমাগম
করেই চলেন ধ্যান।

জ্ঞানের বাহার ছড়ান তারা
নম্রকঠোর প্রাণ
জীবন কাটান সুখে দুঃখে
ছড়ান নূরের ঘ্রাণ।

গড়েন তারা জ্ঞানের আলোক
রেখেই চলেন দূর
নিগূঢ় প্রভাত ছড়ায় ক্ষণে
আঁধার কাটায় ভোর।

শিক্ষাগুরু শেখায় বর্ণ

রানা জামান

শিক্ষার গুরু শেখায় বর্ণ
পড়ায় বসায় মন
শাসন করেন, চক্ষু রাঙান
নষ্ট করলে ক্ষণ।

শিশু হতে ধাপে ধাপে
কাটতে থাকে কাল
শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে
ধরতে শেখান হাল।

পিতামাতার চেয়ে শিক্ষক
নিয়ে থাকেন দায়
শিক্ষকের ছাপ লেগে থাকে
সব শিক্ষার্থীর গায়।

শিক্ষা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে
ছাত্র পৌঁছায় দূর
একই স্থানে থেকে শিক্ষক
বাজায় একই সুর।

কয় শিক্ষার্থী মনে রাখে
শিক্ষকের ঐ দান
কখনোবা চোখ উল্টিয়ে
কমাতে চায় মান।

শিক্ষকের সম্মান

জুলেখা চৌধুরী

শিক্ষকতা মহান পেশা
শিক্ষককে দাও মান
উত্তম শিক্ষা দিয়ে শিক্ষক
বিবেক করেন দান ।

বিদ্যা শিক্ষা বড় শিক্ষা
এই জগতে ভাই
বিদ্যা ছাড়া মানসম্মান
অন্য কোথাও নাই ।

বাবা-মায়ের পরে তারা
অতি আপনজন
শিক্ষকের ঋণ শোধ হবে না
যদি ও দাও ধন ।

সম্মানিত শিক্ষকদের দাও
উপযুক্ত মান
তবেই বেড়ে যাবে মোদের
এই সমাজের শান।

শিক্ষিত লোক বিনয়ী হয়
উচ্চবাচ্য নয়
শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড
জ্ঞানী লোকে কয়।

উচিত শিক্ষা

দিলীপ কুমার পাত্র

আপন জীবন তৈরি করো
আদর্শের পথ ধরে
ন্যায়নীতিটা থাকলে পরে
খুশি আনে ঘরে।

মূল্যবোধের পথে হাঁটো
জ্ঞানীগুণীর সনে
ভুল থেকে নাও উচিত শিক্ষা
থাকে যেন মনে।

ব্যর্থ হলে সামনে যাবো
হাঁটবো না তো পিছে
স্বার্থের জন্য কোনভাবেই
বলবো না তো মিছে।

নিন্দা কুৎসা থাকবো ভুলে
ডুববো সেবার মাঝে
জীবন মানে বাঁচার লড়াই
থাকবো ভালো কাজে।

শ্রদ্ধা ভক্তি রাখবো বুকে
থাকে যেন পণে
অহংকারের ঝুড়িটাকে
রাখবো না তো মনে।

শিক্ষকদের দায়িত্ব

মাহমুদুল হাসান খোকন

পেশা তোমার শিক্ষকতা
মানুষ গড়ার কারিগর,
নিজ দায়িত্ব পালন করে
সাজাও তোমার বাড়ি ঘর।

শিক্ষার্থীদের ফাঁকি দিলে
পড়বে নিজে ফাঁকিতে,
সঠিক সময় ক্লাসে ঢুকবে
এসেছেন যে যা দিতে।

ইচ্ছা করে কেউ কখনো
অলসতা করবে কেউ!
আমলনামা বরবাদ হবে
বন্যার মতো ধরবে ঢেউ।

দশটা থেকে শেষ পর্যন্ত
প্রতিষ্ঠানে থাকতে হয়,
সমাজের সব মন্দ ছেড়ে
ভালো কর্মে ডাকতে হয়।

ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

প্রাথমিকের শিক্ষক

আব্দুল কাদের

প্রাথমিকের শিক্ষক যিনি
গড়েন শিক্ষার ভিত্তি
কোমল হাতে যত্ন করেন
শিশুর জীবনকীর্তি।

বর্ণ শেখা বর্ণ লেখা
প্রাথমিক দেন শিক্ষা
কোমলমতির হাতেখড়ি
লাভ করে তাই দীক্ষা।

প্রাথমিকে শিক্ষক যিনি
পড়ান ধৈর্য ধরে,
কত শিশুর মাথার মণি
হয়ে থাকেন পরে।

শোনে কমই বৃদ্ধ হলে
কানটা হয় যে বধির,
শেষ জীবনে কমই জোটে
সুখের জীবন অধীর।

পদোন্নতি হয় না দেখা
চাকরি বয়স শেষে,
পেনশন জোটে শেষের দিকে
স্বজন খুশি হেসে।

সারিয়াকান্দি, বগুড়া

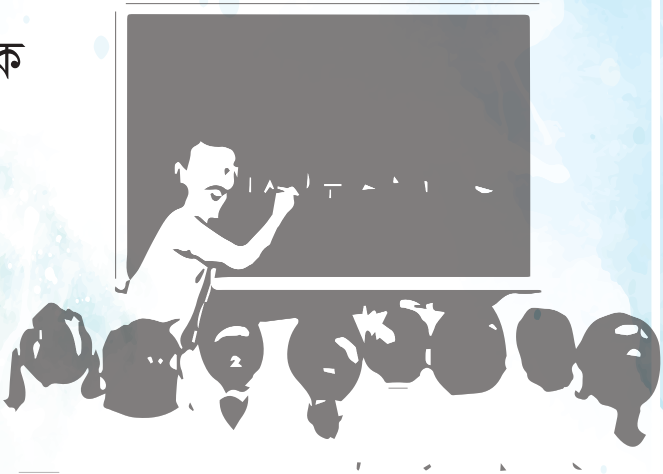

শিক্ষকেরা ভালো থাকুন

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

ছোট থেকে আমায় যাঁরা শিক্ষা দিলেন জ্ঞান
তাঁদের নিয়ে কখনো কি করছি আমি ধ্যান?
কেমন আছেন শিক্ষকেরা, কেমন কাটে দিন
তাঁদের থেকে শিক্ষা নিয়ে শোধ করেছি ঋণ?

না, কভু নয়! যায় না এ ঋণ শোধ করা তো আর
শিক্ষাগুরুর কৃতজ্ঞতা তাইতো বারংবার।
জ্ঞানের আলো বিলান তাঁরা, আঁধার করেন দূর
আমরা হলাম জ্ঞানপিপাসু, তাঁরা সমুদ্দুর।

দোয়া করি শিক্ষকেরা ভালো থাকুন বেশ
শিক্ষকেরা থাকলে ভালো থাকবে ভালো দেশ।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-২২০২, ময়মনসিংহ

শিক্ষা গুরু

সৈয়দ আহম্মেদ সাদি

লম্বা হলেই জ্ঞান বাড়ে না
শিক্ষা গুণে বাড়ে ,
খোঁজো তুমি জ্ঞানের ভান্ডার
যাও শিক্ষকের দ্বারে।
সুশিক্ষকগণ কোনোদিনই
কয় না কথা কটু ।
শাসন করুক নাই সমস্যা
জ্ঞান বণ্টনে পটু ।
শিক্ষা ছাড়া মানুষগুলোই
মূর্খ হয়ে রহে ,
সারাজীবন মূর্খের ওজন
নিজের ঘাড়ে বহে।
শিক্ষকের দান মন মগজে
ভরে নিতে হবে ,
শিক্ষক ছাড়া সুশিক্ষিত
কে হয়েছে কবে ?
শিক্ষক মানে আলোর বাতি
মাথায় তুলে ধরো ।
যেথায় থাকুক পাঠের গুরু
খুঁজে সম্মান করো ?
তালের টেক, খিজির ম্যানশন

ডি/৫ , খিলখেত-ঢাকা-১২২৯

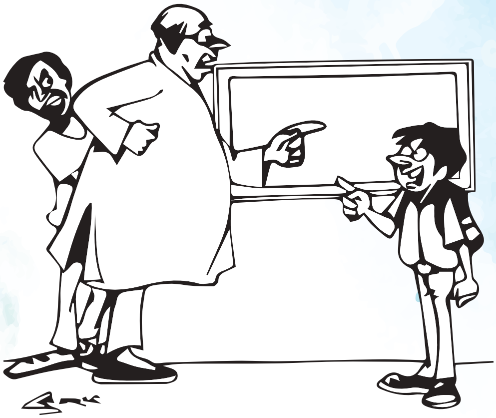

পাঠশালার গুরু

নজমুল ইসলাম খসরু

বলছি শুনো আমার প্রিয় পাঠশালারই গল্প
ছাত্র ছিলাম শত দুয়েক গুরু ছিলেন অল্প।

শিরিশ গাছের ছায়ায় ছিল চারটি মোটে ঘর
তিন ঘরে আর গাছের তলায় ক্লাস হতো পর পর।

অঙ্ক স্যারের নামতা শিখা বাংলা স্যারের লেখা
হেড স্যারের বেতের বাড়ি ফুলতো হাতের রেখা।

শিখছি কিছু তাদের কাছেই শাসন ছিল কড়া
লক্ষ্য তাদের একটা ছিল ভালো মানুষ গড়া।

প্রিয় গুরু বলে আজও তাঁদের স্মরণ করি
চলি যেন সদা মোরা তাঁদের দীক্ষা ধরি।

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

জাতি গড়ার কারিগর

সাইদুল ইসলাম সাইদ

জাতি সচল রাখতে যারা
দিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষা
তাদের ভাই আজ মূল্য কোথায়
জানাই শুধু দীক্ষা।

নিজের মেধা সব দিয়ে যায়
মানুষ গড়ার জন্য,
বড় হয়ে না হয় যেন
অমানুষ আর বন্য।

সেসব প্রিয় মানুষদের ভাই
করছি হেলা নিত্য,
মূর্খের কদর এই দেশে আজ
করছি তাদের বৃত্য।

বাবা মায়ের পরেই তারা
মানুষ গড়ার আস্থা,
কচিকাঁচা বড় হয়ে
ধরবে সঠিক রাস্তা।

তাদেরকে ভাই সস্তা ভাবি
ঘৃণা করার পাত্র,
আরও ভাবি এই সমাজের
ছাগল-পাগল মাত্র।

শিক্ষার্থী, টংগী সরকারি কলেজ
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

শিক্ষাগুরু মা

মিয়াজী তোফায়েল আহমাদ

গৃহেকোণে সর্বপ্রথম
মায়ের কাছে শুরু,
বর্ণমালা শিক্ষার জন্য
মা যে আমার গুরু।

সত্য কথা ন্যায়ের বাণী
মায়ের কাছে শিখি,
বর্ণের সাথে বর্ণ মিলায়
হাজার শব্দ লিখি।

মায়ের দোয়া স্রষ্টার দানে
খুলে বিবেক বুদ্ধি,
শিক্ষাদানে মা যে বলেন
রাখবে আত্মশুদ্ধি।

হৃদয়ঘরে ফ্রেম করে
রাখি মায়ের বলি,
দিবানিশি সর্ব কাজে
আজো মেনে চলি।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নয়নমনি
মাকে ভালোবেসে,
সুখে দুঃখে থাকো সবাই
আপন পরিবেশে।

ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা।

শিক্ষক আমি হইনি ভালো

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

শিক্ষক আমি জাতির বিবেক
বলেন সর্ব লোকে,
এই সমাজের হাল-হাকিকত
দেখে মরি শোকে।

গুরুজনদের দেখে হলাম
শিক্ষক নামের জাতি,
আর্থিকভাবে দৈন্যদশায়
যেন সাদা হাতি।

লবণ আনতে পান্তা ফুরায়
তেল ডাল আনতে চিনি,
বাকি রইলো অনেক কিছুই
কী দিয়ে আর কিনি?

তবু সবাই বলতে পারে
শিক্ষক থাকেন ভালো,
আধপেট খেয়ে বেঁচে আছি
ছড়াই জ্ঞানের আলো।

তাইতো বলি শিক্ষক আমরা
সালাম আদাব পাবো,
শিক্ষক আমি হইনি ভালো
কীভাবে আর খাবো?

তবু আছি এই পেশাতে
সম্মান আছে জানি,
শিক্ষা দেওয়া মহান পেশা
এই কথাটাও মানি।

কবিতা

সাফল্য ঠিক ধরা দেবে

শাহীন খান

পিতা-মাতার পরেই হলো শিক্ষা-গুরুর মান,
শিক্ষা যদি না দিতো সে, বাড়তো কী আর জ্ঞান?
থাকতে পড়ে অন্ধকারে, খোকন সোনা তুমি,
তোমার প্রাণে বাজতো নারে সুখেরই ঝুমঝুমি!

থাকতে হতো সবার পিছে, বলতো লোকে বোকা,
তোমার বুকের বসত ঘরে থাকত ঘুণপোকা।
তোমার ভুবন আলোয়-আলোয় ভরতো না তো হায়,
বইতো না তো সুখের বাতাস হৃদয়-আঙিনায়।

মানুষ হয়েও পশুর মতো হতো তোমার সব,
আসতো না তো কোনোদিনই আনন্দ-উৎসব!
তাই তো বলি, খোকনরে তুই, শিক্ষককে দিস মান,
তার বদলে পেয়ে যাবি খ্যাতি ও সম্মান।

করবে দোয়া শিক্ষাগুরু সকাল-দুপুর-সাঁঝে,
সাফল্য ঠিক ধরা দেবে তোমার প্রতি কাজে।

বানারীপাড়া, বরিশাল

উস্তাদজি

মুহাম্মদ আবু সালেহ

শিক্ষাগুরুর প্রতি মর্যাদা
মূর্খ-জ্ঞানীর অন্তরে সদা

হে আমার প্রিয় শিক্ষক
দিয়েছো এগিয়ে চলার প্রেরণা,
যা সম্বল করেছে মোরে
জীবন চলার উদ্দীপনা।

জীবনের এই পথ চলায়
তুমি হীন আমি যে এক অসহায়,
হয়তো খুঁজে বেড়াবো হামেশাই
কিন্তু তুমি যে আজ দূর-অজানায়।

তোমার পরশে ধন্য ছিলাম
আমরা একঝাঁক নবীন,
তুমি চলে গেলে ছেড়ে মোদের
আমরা কি পাব সে প্রবীণ!

আদর্শের রাজা

মেরাজুল ইসলাম শওকত

আমার কাছে শিক্ষক আমার গুলবাগিচার ফুল
যাঁর সুবাসে মুগ্ধ মোরা হয় না যে তাঁর তুল।
আমার কাছে শিক্ষক আমার ক্লান্ত ক্ষণের ছায়া
যেই ছায়াতে শান্তি ফিরে জুড়ায় এ প্রাণ কায়া।

আমার কাছে শিক্ষক আমার মাথার মণি-তাজ
তাঁদের কাছেই শেখার শুরু সাজি জ্ঞানের সাজ।
পারবো নাহি শোধ করিতে তাঁদের অবদান
আমার কাছে উন্নত তাই শিক্ষাগুরুর মান।

ধরার বুকে জ্বালতে আলো তাঁরাই দেখান পথ
অনন্য ফুল হতে শেখান- 'থাকতে হবে সৎ।'
করতে জীবন আলোকিত ভুলকে ফেলে পাছে
স্বপ্ন দেখার উৎসাহ পাই আমরা তাদের কাছে।

শিখছি সদাই তাঁদের কাছে সততা ও নীতি
মনের গহিন থেকে তাঁদের জানাই শত প্রীতি।
অনুসরণ করেই তাঁদের মনকে করি তাজা
আমার কাছে শিক্ষক আমার আদর্শেরই রাজা।

শিক্ষার্থী, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা।

শিক্ষাগুরু

মো: ফারুক হোসেন

শিক্ষাগুরু মানুষ গড়ার সোনার কারিগর,
জীবনভরে আলোর দিশা দেন নিরন্তর।
অক্ষর শেখান ধৈর্য ধরে, খুলে দেন চোখ,
অজ্ঞতার আঁধার ভেঙে দেন জ্ঞানের শোক।

তাঁর কণ্ঠে মেলে আশা, জাগে প্রাণে গান,
শিক্ষার সোপান বেয়ে খুঁজে পাই জ্ঞান।
তিনি শেখান সততা, সত্যের পথে চলা,
মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোবাসা ভোলা।

শিক্ষাগুরু শুধু নন শিক্ষক, পথের দিশারী,
তাঁর শেখানো বাণীতে খুঁজি জীবনের ভারী।
তিনি গড়েন সৎ নাগরিক, নৈতিকতার ঢেউ,
মিথ্যা-অন্যায় দূরে ঠেলে সত্যের আলো বেয়ে।

তাঁর ত্যাগে গড়ে ওঠে জাতির ভিত্তি মজবুত,
তাঁর হাতে আঁকা হয় দেশের স্বপ্নমূর্ত।
মায়ের মতো স্নেহ মেলে, বাবার মতো শাসন,
শিক্ষাগুরুর হৃদয়জুড়ে ভালোবাসার ভাসন।

শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধার পাত্র, সমাজের অমূল্য ধন,
তাঁর হাতেই খুঁজে পায় জাতি উন্নতির বন।
তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই সকাল-বিকেল,
তাঁর আশীর্বাদে কাটুক জীবন সুখ-সফল।

শ্রদ্ধা জানাই শিক্ষাগুরু, চির ঋণী আমরা,
তাঁর শেখানো আলোয় ভরে উঠুক জীবনভরা।
তিনি না থাকলে এ জগতে, থাকতাম অন্ধকারে,
গুরুজনের দোয়া চাই, থাকি যেন আলোর দ্বারে।

মেঘনা, কুমিল্লা

হে শিক্ষাগুরু

রাকিবুল হাসান

হে মহাগুরু নবীনদের তরেই
গাইছ তুমি নিত্যনতুন গান,
যুগে যুগে করেছ তুমি প্রাণপণ
দুর্বার, বিপ্লব অভিযান।

হে শিক্ষাগুরু, যেই শাখা-প্রশাখা
তুমি এ ধরায় করেছ বিস্তৃত,
অনাদিকাল এ ভবে অমর হয়ে
রবে, তোমার সীমাহীন কৃতিত্ব।

হে মহাগুরু, শিক্ষাগুরু এ ভবে
তুমি নতুনত্বের পথ দেখাও,
হাজারও ত্যাগ স্বীকার করে তুমি
এ জীবনে পরের মঙ্গল চাও।

হে গুরু তুমি, জীবন্ত সাহিত্য
সকল জাতীর পথপ্রদর্শক,
মানবতার উজ্জ্বল নক্ষত্র
নবজাগরণে নীতি-নির্ধারক।

গুরু তুমি , সত্যে বলিষ্ঠ বীর
সততার গুণে মাতাপিতা তুল্য,
ভবে, রূপান্তরের জনক তুমি
তোমার হাতেই জাতির সাফল্য।

ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা
তুমি হাজারো গুণেরই সমাহার,
গুরু তুমি উদার মনে বিলিয়েছ
বক্ষে জমানো সব শিষ্টাচার।

গুরু ধৈর্যগুণে, পঠন-পাঠনে
বিদ্যালয়ে শ্রেণি কক্ষের প্রাণ,
সুশীল সমাজ গঠনে কারিগর
তুমি, জানাই হাজারোও সম্মান।

মৃত্যু পরিমাণ যন্ত্রণা বুকে
থাকলেও কভু, মুখে মায়ার হাসি,
গুরু, ঋণশোধ করতে পারবো না
শর্তহীন, তোমাকেই ভালোবাসি।

শিক্ষাগুরু, তুমি জাতির স্ম্র
প্রেরণায়,আঁধারে আলোর জ্যোতি
তোমার এ অবদানে গড়ে উঠেছে
ধরার বুকে সভ্য সকল জাতী।

হে গুরু তুমি , হীরার চেয়েও দামি
তুমি আলো ছড়াও সুশিক্ষাদানে
জ্ঞানের রবি তুমি, মূর্খ মানুষ
সোনা হয়ে যায়, সঠিক জ্ঞান দানে।

হে শিক্ষাগুরু, তুমি আছো, থাকবে
চন্দ্র সূর্য থাকবে যতদিন
শ্রদ্ধা সম্মান প্রতি প্রহরেই
ভালোবাসবো সর্বদা প্রতিদিন।

শ্রদ্ধাভাজন

রিদয় ইসলাম

শিক্ষক সে যে মহান শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণ,
বাবা মায়ের স্নেহসম আদর ভালোবাসার জন।
একসময় দেয় ভালোবাসা অন্যক্ষণে করে শাসন,
তাইতো সে সবার প্রিয় আমার শ্রদ্ধাভাজন।

শিখায় তিনি আপন মনে ভাবিয়া নিজ সন্তান,
গড়ে তোলে সেই শীতল আদরে আর মিষ্টি শাসন।
কেমন করে দাও তাকে কুৎসিত অভিনন্দন,
মনে রেখো, সে তোমার জীবনের গুরু শ্রদ্ধাভাজন।

সে হোক না পৃথিবীর নিকৃষ্টতম অপ্রিয় শিক্ষক,
একটি হরফ হলেও শিখিয়েছে, সে তোমার প্রদর্শক।
এমন বিদায় দিও না যাতে সে মনে কষ্ট পায়,
সে তোমার শিক্ষক, আছো তুমি তার হিয়ায়।

সর্বোপরি বলি আমি,
এই শিক্ষক দিবসে জানাই সকল শিক্ষকে শ্রদ্ধা,
জানাই তাদের প্রানঢালা শুভেচ্ছা।
করি দোয়া হে খোদা পালন কর্তা শোন মোর মিনতি,
ভালো রেখো এই শ্রদ্ধাভাজনদের, যারা দান করে ধিক্ষা।

তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ

ন্যায়াধীশ

রাজ্জাক রাজ

একদা রাজ দরবারে এলো কিছু লোক
পরিচয় দিলো তাহারা শিক্ষক।
ছাত্র কাড়িয়াছে তাহাদের আসন
গুরু অপমান, বিচার চাই রাজা।

বিস্ময়ে রাজা চাহি সকল মুখ
শিক্ষা গুরু অসম্মান; এমন শিষ্য কোন বিদ্যাঙ্গন?
গুরু অপমান এ চরম বেয়াদবি
তোমাদের প্রাণ দণ্ড দেবো আমি।

উচ্চস্বরে ছাত্র কহিলো তখনি
রাজা, এ কি বিচার তোমার
কোনকালে ছাত্র করিয়াছে কি? গুরু অপমান।

কহিল রাজা
আজ যে করিয়াছো রাজ্য জুড়ে শুনি
ছাত্র কহিলো রাজা মহাশয়,
আপনার রাজ্যে শিক্ষক কত সংখ্যক?
হইবে কয়েক লাখ! রাজা কহিলো তখনি,
কহিলো ছাত্র লাঞ্ছিত হইয়াছে কজন শুনি?

হইয়াছে, যাহা হউক বাপু
তোমাদের প্রাণ দণ্ড দেবো আমি।

ক্ষণকালে এক বৃদ্ধ আসিল সভাঘর
ছাত্র সকল চরণে তাঁহার লুটিল সালাম।
কহিল বৃদ্ধ সমস্বরে এ কেমন বিচার মহারাজের
গুরু অসম্মান ছাত্র কি করিতে পারে?

চাহিয়া রাজা দাঁড়াইলো আসন ছাড়ি
কুর্নিশে ছুঁইলো চরণ দ্বয় তাঁহারি।
বসাইয়া আপন আরশ, রাজা রইলো দাঁড়ায়!
বিস্ময়ে সকল চাহিলো কিয়ৎক্ষণ; জিজ্ঞাসু অন্তর,
বিজ্ঞ রাজা বুঝিয়া তাঁহাদের মন
পরিচয় করাইল শিক্ষা গুরু মোর।

তখন, কহিলো হাসিয়া শিক্ষাগুরু শোন হে! রাজা
কোন কালে? করিলো না ছাত্র, শিক্ষা গুরুর সম্মান
ছাড়িয়া দাও! রাজা ছাত্র আমার সন্তান।

আদ্য যখন হয়নি আমার অসম্মান
কোন কালে হইবে না ক্ষুণ্ন

প্রধান শিক্ষক

কবি ফটিক ঘোষ

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানবেন্দ্র বাবু,
ভীতু টাইপের মানুষ তিনি সহজে হন কাবু।
নম্র-ভদ্র ব্যবহারে থাকেন সদাই শান্ত,
পায়ে হেঁটে আসেন স্কুলে হয়ে পড়েন ক্লান্ত।

প্রধান শিক্ষক মানবেন্দ্র ভালো মানুষ জানি,
জ্ঞান গরিমায় উচ্চাসনে সবার কাছে মানি।
কঠোর কোমল চরিত্র তার যায় না বোঝা দেখে,
এই তো আছেন ভালো মানুষ, কখন যাবেন বেঁকে।

সকল শাস্ত্রে পারদর্শী পড়ান সকল ক্লাসে,
পান চিবানো স্বভাব তাহার, পানি রাখেন গ্লাসে।
মাঝেমধ্যে বাইরে গিয়ে পিক ফেলে দেন মাঠে,
আকাশ পাতাল কী যে ভাবেন বৃথা সময় কাটে।

মিতভাষী ব্যক্তি বলে জানে সকল জনে,
বিদ্যালয়ের প্রগতির দিক ভাবেন সদা মনে।
ছাত্রছাত্রীর প্রিয় স্বজন পরম বন্ধু তিনি,
খেলার মাঠে সাথী হয়ে খেলা করেন যিনি।

প্রীতি প্রেমে সবার মনে আসনখানি পাকা,
গুরু শিষ্য নাই ভেদাভেদ, হিংসা বিদ্বেষ ঢাকা।
অনুশাসন আর শিষ্টাচারে ভরা জীবনখানি,
আপন সুবাস বিলিয়ে দেন যেন কুসুমদানি।

শিক্ষাগুরুর প্রতি

বসন্ত পরামাণিক

হে কর্মযোগী, তুমি চিরদিন চলেছ মানুষ গড়ে-
পাথরের বুকে প্রাণ জাগিয়েছ অক্ষরে অক্ষরে।
তোমার কাছেই এসে-
জীবনের নদী আদর্শ ছুঁয়ে জ্ঞানের সাগরে মেশে।
হে সাধক, তুমি ন্যায়ের মন্ত্র শিখিয়েছ প্রতি পলে,
আমার, মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।

তোমার হৃদয় সাগর সমান, দয়া মায়া প্রেম ক্ষমা ...
মূল্যবোধের রত্ন আকর রাশি রাশি আছে জমা।
তোমার সাগরতীরে -
নুড়ির মতোই নিয়েছি কুড়িয়ে জ্ঞানের রত্ন-হীরে ।
হে গুণী, তোমার বিবেকের বাণী কানে কানে কথা বলে,
আমার, মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।

পথ চিনিয়েছ, আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত সে পথ,
সে পথে পেলাম সততা এবং আলোর ভবিষ্যৎ।
নিয়ত আপন করে-
বিশুদ্ধ মন, দৃপ্ত চেতনা, তুমি তো দিয়েছ গ'ড়ে।
তোমার প্রেরণামন্ত্র সতত ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলে,
আমার, মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ, পিন- ৭০০১৩৭

শিক্ষক

আবু জুবায়ের

আলো হাতে পথ দেখান যিনি,
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে করেন ঋণী।
তিনিই শিক্ষক, বন্ধু, পথপ্রদর্শক,
ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়েন, জ্ঞান রক্ষক।

অন্ধকারে যখন পথ হয় দিশেহারা,
বইয়ের পাতায় খোঁজেন নতুন তারা।
স্নেহে ভরা তাঁর বচন, কণ্ঠে জ্ঞানের সুর,
করেন মনের যত ভয় আর ত্রুটি দূর।

অক্ষর চেনান, শেখান জীবন চলার নীতি,
তাঁর দেখানো পথে ফোটে আমাদের প্রীতি।
ভুল হলে ধরেন হাত, দেন সঠিকের শিক্ষা,
তাঁরই ত্যাগে পূর্ণ হয় আমাদের দীক্ষা।

শ্রেণিকক্ষ নয় শুধু, সারা জীবনজুড়ে,
তাঁর শেখানো কথা মনে বাজে ঘুরে ঘুরে।
প্রণাম জানাই সেই মহান শিক্ষাগুরুকে,
যাঁর হাত ধরে শুরু হয় বেড়ে ওঠা সুখে।

শ্রদ্ধা হে শিক্ষাগুরু

হাসান মুসান্না মিশু

যে আলোয় আলোকিত এ সারা জাহান,
সে আলো শিক্ষার- সাথে নীতি, জ্ঞান
আজীবন যারা পাঠ করেছেন দান,
তারা মোর ওস্তাদ, ভুবনে মহান।

বাবা মা'র কাছে শুরু শেখাটার পালা,
পরিবার পৃথিবীর সেরা পাঠশালা।
ধাপে ধাপে ভাঙে যারা জাহেলের তালা,
হৃদয়ের প্রেম দিয়ে সঁপি মান-ডালা।

যুগ যুগ ধরে যারা জ্বেলে গেছে আলো,
সমাজের বুক চিরে তাড়িয়েছে কালো।
অশুভকে পায়ে মাড়ি আনিয়াছে ভালো,
সে মহান শিক্ষকে শ্রদ্ধাটা ঢালো।

শাসনে সোহাগে মনে জাগালেন আশা,
মৌন মলিন মুখেই ফোটালেন ভাষা।
জ্ঞানের আলোক নিয়ে এতদূর আসা,
শ্রদ্ধার সাথে গুরু নিন ভালোবাসা।

পেশা: ব্যাংক কর্মকর্তা চাটখিল, নোয়াখালী

শিক্ষক দীক্ষক

বদরুল হক

শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয় শিক্ষকের হাত ধরে,
শিক্ষক হলেন পিতৃতুল্য এই জগতের পরে।
শিক্ষক-দীক্ষক মহানঋষি জ্ঞানের পরশমণি,
নৈতিকতা প্রজ্ঞা-নিষ্ঠা উদারতার খনি।

দেশ সমাজের উন্নয়নে কর্ম করেন নীতি,
সবার সঙ্গে বজায় রাখেন বন্ধুত্বভাব প্রীতি।
সভ্যতারই ফুল ফোটাতে জীবন রাখেন বাজি,
মানব হিতে ত্যাগ স্বীকারে থাকেন সদা রাজি।

মানুষ গড়ার মহান ব্রত ধারণ করে বুকে,
শিক্ষাদানে সারাজীবন নিজকে রাখেন ঝুঁকে।
আঁধার মনে জ্বালান সদা জ্ঞানের মহান আলো,
দূর করে দেন মলিনতা অজ্ঞানতার কালো।

শিক্ষকের শির উর্ধ্বে সবার সন্দেহ নেই তাতে,
সম্মানের তাজ অটুট থাকুক শিক্ষাগুরুর মাথে।

শিক্ষকের মান

মো. মাঈন উদ্দীন রাকিব

শিক্ষক হলো শ্রেষ্ঠ সবার জাতির মহান কান্ডারি
সেই শিক্ষকে বাদশাহর পুত্র পায়ে ঢালিছে বারি।
এতে ক্ষুব্ধ সুতের তরে-শাসালেন তাই শাহেনশাহ
পুত্রের এহেন আচরণে আশা হলো দুরাশা।
স্বীয় হস্তে সাফ করলো না আপন গুরুর সাহায্যে
এহেন হীন কাজে মাথা কাটছে আজ তাই তার লাজে।

শিক্ষকের মান সবার ঊর্ধ্বে উঁচু রবে সদা শির
আপন গুনে শিষ্যকে তার গড়ে তোলেন মহান বীর।
অ আ ক খ নয়তো কেবল শিখান তাদের আদর্শ
জ্ঞান জঁজালে দক্ষ হস্তে গড়েন তিনি সেই শিষ্য।
শিখান লাযা দারুল ক্বারার - মন্ত্র তিনি সৃষ্টিতে
গড়ে তোলেন যুগাবতার পিশাচ দানব দমিতে।

সেই শিক্ষকের সম্মানে আজ করে না তো কেউ কুর্নিশ
গুরুর সনে বিয়াদবি করছে শিষ্য অহর্নিশ।
গদির তাপে দগ্ধ শিষ্য করছে গুরুর অপমান
এই হীন কাজে উল্লাসে বুক ফাটে হারিয়ে লব্ধ জ্ঞান।
কখনো বা গুরুর ভালে জোটে শিষ্যের কিল থাপ্পড়
এহেন কাজে পিতা মাতা কেবল নিরব কারিগর।
এসব শিষ্য আবার নাকি করবে মোর দেশকে শাসন
দুর্নীতিতে করবে তারা দেশ মোদের নির্বাসন।

শিবপুর, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

শিক্ষক ও ইসলামী জ্ঞানের আলো

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আল মাহমুদী

জ্ঞানই আলো আঁধার ভেদে, জ্বালে আলোর দীপ,
ইলম ছাড়া মানবজীবন যেন মরুতে হালকা স্রোতের সিপ।
"পড়ো" বলে দিলেন আল্লাহ, এ ছিল প্রথম ডাক,
জ্ঞানের আলোয় উঠল মানব, মুছে গেল অন্ধকারের পাক।

কলমের কসম করলেন রব, দিলেন শিক্ষা চির,
শিক্ষক হলেন সেই আলো, যিনি দিলেন পথের নীর।
নবীদের উত্তরসূরি, জ্ঞানের উজ্জ্বল মুখ,
তাঁদের ছায়ায় ফোটে জাতি, মুছে যায় সকল দুখ।

তিনি শেখান নম্রতা, আনেন হৃদয়ে নূর,
ভালোবাসেন জ্ঞানের পথে, ছড়ান তাওহীদের সুর।
একটি দোয়া, একটি বাণী, পাল্টে দেয় হৃদয়,
শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা তাই চিরন্তন, অমলিন অক্ষয়।

রাসূল ﷺ বলেছিলেন- "আলেম নবীর উত্তরাধিকার",
তাঁর ইলমে বদলে যায় জনপদ ও পরিবার।
ইলম যার বুকে থাকে, সে আলোর মানুষ হয়,
তাকওয়ার গন্ধ ছড়ায় তার মাঝে, অমলিন নির্মল সয়।

শিক্ষক সে বৃক্ষ, ফল নিজে খান না, দেন ছায়া,
তাঁর হাতে গড়ে উঠে জাতি, ঝরে মমতার মায়া।
ঝড় এলে ও থাকেন স্থির, আলোয় করেন পথ,
তিনি যেন মোমবাতি, জ্বলে নিজে, দেয় আলো শত শত।

ইলম যার নয় আল্লাহর পথে, সে জ্ঞান অন্ধকার,
শিক্ষক যার দৃষ্টি সোজা, তার জীবন আলোকিত আর।
মজলিসে তাঁর কথায় ভরে হৃদয়ের ভূবন,
ইলম ছড়িয়ে গড়েন তিনি রুহানি এক ধন।

আদর্শ মানুষ

অ্যামেলিয়া দাস

অধ্যয়নই মূলমন্ত্র, এগিয়ে যাওয়ার পথ
শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মহৎ দানেই চলে জীবনের রথ,
শিক্ষণীয় বিদ্যাভ্যাস অর্জনের পথ দেখান
লেখাপড়া, খেলা, আঁকা, নাচ কিংবা গান;

মূল পাঠ্যবস্তুকে খুব সহজে বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা
পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তৈরি করার পারদর্শিতাই শিক্ষকতা,
তাদের অভিজ্ঞতা, কিছু মৌলিক গল্প কথা, আনন্দিত করে মন
প্রতিভায় তাই শিক্ষায় ভরা জীবন বাছেন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ;

সহজ-সরল উপস্থাপনায় বিজ্ঞান হোক বা সাহিত্য
ভালো লাগে পড়তে, আনন্দ হয়, ইচ্ছে জাগে, জাগে জ্ঞানের আদিত্য,
অজানাকে জানা, কিছু শেখা
চিনিয়ে দেন তারা জীবনরেখা;

উপদেষ্টা হয়ে পথ দেখান তারা
ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাবলম্বী করে তোলেন শিক্ষার দ্বারা,
রাখেন নব প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার
বাঁচবে সমাজ, বাঁচবে দেশ, আর এর জন্য জরুরি প্রকৃত শিক্ষার।

ওস্তাদজী

আব্দুস সাত্তার সুমন

জীবনের বড় শিক্ষক হলেন পিতা-মাতা
দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মকুটদাতা,
শিক্ষা হবে ঘর থেকে অতি উত্তম ব্যাপার
ওস্তাদজি তিনি মোদের হাতেখড়ি দেবার।

পাঠশালাতে বিদ্যাবুদ্ধি সব দিয়ে থাকেন
ওস্তাদের পরিশ্রমের শিক্ষা দিয়ে রাখেন,
বিদ্যাপাঠ অতি ধৈর্যের কাজ দিয়েছেন যারা
শিক্ষার্থী তৈরি করে তিলে তিলে গড়েন তারা।

সমাজের সম্মানিত শিক্ষকের সূচনা
আজ তারা প্রতিষ্ঠিত সমাজের রচনা,
প্রাণের শিক্ষক শিক্ষিকার খোঁজখবর কি রাখি?
যারা জীবিত ওস্তাদজি দেখবে দুটি আঁখি।

রাসূল হলেন প্রধান শিক্ষক এই ধরার মাঝে
আদর্শে আঁকড়ে ধরবো সকাল সন্ধ্যা সাজে,
শিক্ষক-শিক্ষিকা ওস্তাদজি তারা সকলের
চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দাও আমাদের।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, বাংলাদেশ

শিক্ষক

উমাইরা নাবিহা

শিক্ষক তিনি আমাদের আদর্শেরই প্রতীক
তার দেখানো পথে চলি আমরা যারা পথিক।

শিক্ষক তিনি সৃজন করেন মহান মানুষ সব
দূর করে দেন অমানিশা-আঁধার অনুভব।

শিক্ষক হোন যে রক্ষক, জাতির প্রতিভার
দুঃসময়ে-সুসময়ে তিনিই অটল পাহাড়।

শিক্ষক তিনি অতুলনীয় জ্ঞানের মহাসাগর
তার কাছেতে আমরা ঋণী সারা জীবনভর।

লেখক পুরস্কার

মাসিক
nabinkantho.com
নবীনকণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

সিরাতুন্নবী সা.

আগস্ট, ২০২৫ খ্রি. রবিউল আউয়াল-১৪৪৭ হি.
ভাদ্র- ১৪৩২ ব. ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

মাসিক নবীনকণ্ঠ আগস্ট-২০২৫ খ্রি. এর 'সিরাতুন্নবী সা.' সংখ্যায়, যে চারজন সেরা লেখক/লেখিকা নির্বাচিত হয়েছেন;

১
কাজী সুলাইমান
ছড়া

২
সাদিয়া আনজুম
কবিতা

৩
আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফি
প্রবন্ধ

৪
মাহমুদ হাসান ফাহিম
প্রবন্ধ

নির্বাচিত লেখকগণ নবীনকণ্ঠ'র ফেসবুক পেইজে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো।

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

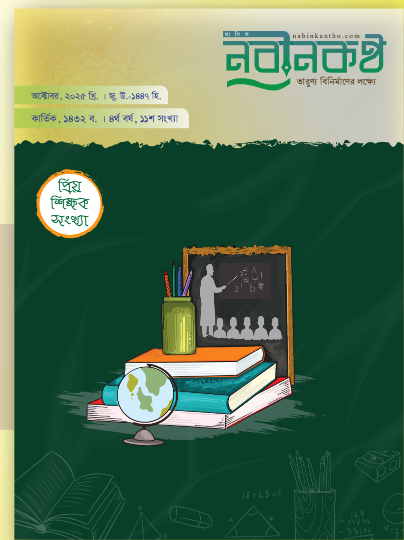

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. পাবলিকেশন্স

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com
যোগাযোগ: 01789204674